স্বপ্ন

সম্পাদনায়
প্রণব চাকমা

সহ-সম্পাদক
জয়েস চাকমা

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি
(একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন)
বনযোগীছড়া, জুর'ছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

স্বপ্ন

প্রকাশকাল
বিঝু ২০১৪ ইং

সম্পাদক
প্রণব চাকমা

সহ-সম্পাদক
জয়েস চাকমা

সম্পাদনা সহযোগীতায়
শান্তি চাকমা, অনুদেব চাকমা, নোবেল চাকমা তমেশ, বিপ্লব চাকমা , অনেজ কান্তি চাকমা, প্রশান্তি চাকমা, ধীরা তালুকদার, রতন মণি চাকমা ও শোভন চাকমা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
লিটন চাকমা অন্নদা ও বিপ্লব চাকমা

প্রচ্ছদ
মামুন হোসাইন

মুদ্রণ ও বর্ণবিন্যাস
ছড়াথুম, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

শুভেচ্ছা মূল্য
২০০ টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ
বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি
বনযোগীছড়া, জুর'ছড়ি
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।
ই মেইলঃ bkkksrj@yahoo.com
www.banajogichara.org

Contact Adress:
Banajogichara Kishor Kishori Kalyan Samity
Banajogichara, Jurachari
Rangamati Hill District
e-mail: bkkksrj@yahoo.com
www.banajogichara.org

সম্পাদকীয়----------

সময়ের স্রোতে দেখতে দেখতে ২০১৩ সাল পেরিয়ে হাজির হলো ২০১৪ সাল এর বিঝু। জাতীয় জীবনে গত এক বছরে ঘটে গেলো অনেক কিছু ঘটনা। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সারা দেশের জনগণ এর মধ্যে ছিল এক চরম উত্তেজনা। হরতাল আর ধংসাত্বক রাজনীতির কারণে পার করতে হয়েছে এক উৎকণ্ঠিত সময়। জাতীয় রাজনীতির সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিও সুখকর নয়। দিন দিন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা মোটেও কাম্য নয়। অমরা বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য সব দায়িত্বশীল পক্ষকে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য করজোরে মিনতি জানাচ্ছি। আমরা সংঘাত চায় না, শান্তি চায়। আমরা উন্নতি চায়।

বনযোগীছড়া পাঠাগার নিয়ে আমরা অনেক সাড়া পেয়েছি, বিশেষ করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ খুবই আশা ব্যঞ্জক। আমরা এ পাঠাগারকে আরো এগিয়ে নিতে চায়, সমৃদ্ধ করতে চায়। এ অগ্রযাত্রায় সকলের ঐকান্তিক সহযোগীতা কাম্য।

আমাদের এবারের সংকলনের নাম ***স্বপ্ন***। আমরা এখনো স্বপ্ন দেখি এক সুখী, সুন্দর জাতির। এক উন্নত স্বদেশের। আমাদের প্রত্যাশা আমাদের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে পরিণত হবে।

আমরা সব সময় আমাদের সংকলনে নবীন লেখকদের হাতের লেখা ছাপায় তাই অনেক লেখার মান নিয়ে পাঠকমহলের মন্তব্য থাকা স্বাভাবিক। অমরা আমাদের সংকলনকে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করি। সংকলনে প্রকাশিত লেখাগুলোর বক্তব্য লেখকদের একান্তই নিজস্ব। লেখাগুলোর ব্যাপারে সম্পাদনা পরিষদ বা সমিতি কোনভাবে দায়ী নয়।

আমরা যথেষ্ট যত্ন নিয়েছি সংকলনের প্রুফ সংশোধনের, তারপরও ভুল থেকে যাওয়া একেবারে স্বাভাবিক। আশা করি সংকলনে অনিচ্ছকৃত ভুল পাঠক মহল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বিঝু বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি। সবাইকে বিঝুর শুভেচ্ছা।

সূচী

চাকমা কলাম/প্রবন্ধ

কারে উজুলেম, কারে কোজোলী গোরিম? / চাঙমা ত্রিপন তেইয়া-৬

বাংলা কলাম / প্রবন্ধ

প্রসঙ্গঃ আরাকান উত্তর অঞ্চলের সাক অধিবাসীগণ / সুপ্রিয় তালূকদার-১১

পাবর্ত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য চর্চা / শিশির চাকমা-১৬

মঞ্চ নাটকের ডিজিটাল ধারনা / মনোজ বাহাদুর-২১

পার্বত্য চট্টগ্রামঃ বর্তমান আদিবাসী খন্ডচিত্র / আনন্দমিত্র চাকমা-২৭

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিদের ভাষা প্রসার ও
বিকাশে অন্তরায় ও উত্তরণে করণীয় / শুভ্র জ্যোতি চাকমা-৩১

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ঃ রাজমালার সমাজচিত্র/আজাদ বুলবুল-৪৫

সাহিত্য, সমাজ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য র্চচা / প্রগতি খীসা-৫৪

মাতা পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য / ড. অমর কান্তি চাকমা-৫৭

আমাদের আদিবাসী তরুন - তরুনীরা / অম্লান চাকমা-৬১

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের অমনযোগী চাষাবাদ ব্যবস্থা / লিটন চাকমা অন্নদা-৭১

চাঙমা কবিতা

কবিতের গদঙ্গ কলিকাতা / মৃত্তিকা চাকমা-৭৩

মন কানিল্যা / তরুন কুমার চাকমা-৭৪

চাত্যেই / ঝিমিত ঝিমিত চাকমা-৭৫

কবালর ভাচ্চানি / জগৎ জ্যোতি চাকমা-৭৬

থগারাম / বীর কুমার চাকমা-৭৭

তরে কোচপাং ভিলি / কিশলয় চাকমা-৭৮

বুদ্ধিয়ে কুল ধরে / বারেন্দ্র লাল চাঙমা-৭৯

হেদাফল / নির্মল কান্তি চাকমা-৮১

ম' দেঝ / সুগম চাকমা-৮৩

অলি অলি / স্মৃতি জীবন তালুকদার-৮৩

হ্ক কধা / মনো রঞ্জন চাকমা-৮৪

আদাম ভাঙা জু উঠ্যা / নম দীশ চাকমা-৮৫

পেত্তোমরা মনর ভাচ্ / সরোজ কান্তি চাকমা-৮৬

গরু বেজি রজেই কিনানা / সঞ্চয় বিকাশ চাকমা-৮৮

মানেয়র রীতি সুদম / আলপনা চাকমা-৮৯

বেন্যা মাধান / পাততুরুতুরু চাকমা-৯০
ন' পারিবে / উদয় শংকর চাকমা(মড়লা টাবিট)-৯১
দিবে লামা / সুপেন চাকমা-৯২
শ্রাবক বুদ্ধ বনভান্তে নির্বানত / সুশীল বিকাশ চাকমা-৯৩
মনত থেব' / সন্তোষ চাকমা-৯৪
তঞ্চঙ্গ্যা কবিতা
কন্না দাঁঅর / লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা-৯৫
ত্রিপুরা কবিতা
ককলব কবগ' আন' / শ্যামলাল দেববর্মা-৯৬
আনি নগ'/ চন্দ্র কান্ত মুড়াসিং-৯৭
গল্প
যক্ষা বাবর বর ঘুম / চিত্র মোহন চাকমা-৯৮
চিক্কোবীর জিদ / ভিএন চাঙমা-১০০
বিশেষ রচনা
আমার হাইজ্যাক হওয়া গান / রনজিৎ দেওয়ান-১০২
দেবাশীষ রায় / কালিন্দিঃ চাকমা রাণী (একটি সত্য কাহিনী)
(ইংরেজি থেকে অনূদিতঃ পাপেল চাকমা)-১০৬
কাত্তোল পাগোক, বিঝু এযোক..../ মুজিবুল হক বুলবুল-১১৫
বাংলা কবিতা
জাগো বিশ্ব চাকমা ইন্ডিজিনাস / অনিল বরণ চাকমা-১১৮
মুখোশ নয় / চাকমা অসীম রায়-১১৯
তখন প্রথম যৌবন / শ্যামল তালুকদার-১২১
ভরা পূর্ণিমায় / নজরুল ইসলাম সাচী-১২২
কেবল কবিতাই পারে / সিরাজুল করিম-১২৩
তোমাকে মনে পড়ে / কে.ভি. দেবাশীষ চাকমা-১২৪
রবি তুমি লহ প্রণাম / সুনির্মল কুন্ডু-১২৫
এক চিলতে উঠোনের গল্প / লক্ষ্মী কান্ত কর-১২৫
ব্যাথার যন্ত্রণা / মিনাক্ষী চাকমা-১২৬
বসন্ত / রিমি চাকমা-১২৭
বাবা / বর্ণা চাকমা-১২৮

চাঙমা ত্রিপন তেইয়া

কারে উজুলেম, কারে কোজোলী গোরিম?

একদিন, আদিক্যে গরি, মনানত্ চিদে ছমিলো। মনত্ কি উধে, কি পরে, কোই ন'পারং। চিদে - গরি কুল ন' পাং। মানেয়-জিংকানীর গঙারত সুগ-দুগোর নাল-আহ্ধি যায়। জিংকানীর ছরাপানি থাক্কে থাক্কে পহ্ন অয় আ হাক্কে হাক্কে কুলুগ অয়। আ, অক্তে অক্তে আধিক ঝরে, শিলে-বোয়েরে, পানি-বানে, জিংকানীর বরগাঙ' কুল পেলাঙ বে-যায়। তেহ্, গোদা আদাম, কলগ'-ভূই বুরেই, ভাযেই নে-যায়। ইয়েনি সেরে সেরে আ বরব', ভুজোল, অনজুর বে-থায়। আ, বারিজেত্ থাক্কে থাক্কে দেবাকালা, দেবাপারাগ গরে, দেবাবো ঝিমিত-ঝিমিত ঝিমিলায়। কধক আগাজ' বাজ ফেলায়। এহ্দা জুরোয়, পরান চুলো-আগাত উধে। বাজিবার আঝা ন'থায়। তুও দ' আমি নূঅ-গরি ঘর তুলি, নূও-গোরি জিংকানী কাদে যেই, পরান-বাজি থেবার আঝায়।

পিথিমিত কন'কিত্তে, কন' দেঝত্, কন'জাদর সুন্জুক নেই। তুওদ' কনজনে, অলর-গরি থেয়ে বাবর-পুত্ নয়। জিংকানী-লই তারা লারেই বাঝে-বাঝে থেই পান। তুও তারা নূও-গোরি ভালেদ্ অহ্ভার স্ববন দেগন। নূও-গরি দুগকাম' বাগত্ লামন। ঘরপাদা, পোঝাপিরে জুরিবার চান। নিজো জাদর নাঙ রাগেবার চান। জাদত্তেই, যে বল আঘে, যে বল নেই, নীঘিলান। সেদাম যিদ্ধুর আঘে, জযা চান। পিথিমিত্ জিৎবাত গোরি, জাদ'রে যিঙিরি পারে, বাজেই রাগেবার চান।

তেহ্, আমারও ইধু কন' সুন্জুক নেই। ঘরপাদা থিদে নেই। তুওদ' আমাত্তুন আমা জাদ' পোজা কালোং, দবাকাদি, সচপদর জায়-জুক্কল বেক্কানি সমরা পরিবো। ইয়েনি, আমাত্তুন দোলেদালে চেরেত্তা গরা পরিবো। কিত্তেই, আমি দ' আমারে জুম্ম-জাদ হোলেই। জুম্ম নাঙে বাজি থেবার চেই। আমি যুনি সজাগ অহ্লে, আমি গুনর অহ্লে, আমার কারত্তুন কনকিচ্ছু উধোর লো ন'পরে। কার' সিধু, যেই-যেই. হুজি-হুজি কনক্কান মাঘা ন'পরে। মাত্তর, আমাত্তুন শত্পুরো অহ্ভার চেলে, জাদর চেদন লাগিব। কান-সজাগ আ চোগ-পহ্র ও-পরিবো। জাদ'কামত্ তানা-পোজ্জেন মিলেই জানা পরিবো। যুগ'লগে গমেদালে, ভালেদি-সাঙুত হুজ-বারা পরিবো। আমা ভিধিরে দোয়ে-মেইয়ের রেগা-বাহ্না পুরিবো। কধা শুনো-শুনি, মানামানি গরা পুরিবো। গম জাদ' হুজ আহ্ধা পরিবো। ন'অহ্লে ইত্তুন-পারা উযেই যে ন'পারিবোং। গম-জাদ হোলেই ন'পারিবোং। তেহ্, উমোরবো আমি, পেত্তোমরা, তেনা-পোগরা, চিগোন-ধাঙর, লামালাম্মে আ তানাতান্যে-বানাবান্যে গরি থে-পেবং।

মানেয়-কুলোত্ জন্ম অহ্লে শিগেনা থুম ন'অহ্য়। কক্কে-কক্কে ইয়োত্ ফুরেই যায়, থার্ ন'পায়। দাঘ'কধাঃ তাল যে-যায় ভুলুগো নাচ্। চিগনত্তুন ধরি, মুই কধক শিগিলুং, দেগিলুং, দুগ-সুগ লাগত পেলুং। চাঙ্গে, মুই দ' ইক্কে মুই নয়। যিদ্দুর অহ্ভার কধা, মুই সিদ্দুর ওই ন' পারং। ম' মন'আঝা, স্ববন বেগ আহ্রেই গেল'। ইক্কে মুই পোত্তাঙর। মনে মনে আহ্ঙি যাঙর। ইক্কে,মান্ন্যে এক ধক, আমনে এক ধক। মুই যুনি মুই অধুং, সালেন মুই ইক্কে, ভালেদ অধুং। জাদ' সিধু বিজোর যোদুং। বেক্কুনে চিনোন-পারা গম মানুয অধুং। জাদ' সিধু নাঙ রাগেই পাত্তুং। মুই ইক্কে ম'জাদত্ মুই হরুলো, অগুনর। জাদনাঙে মুই কিচ্ছু দেগেই ন'পারং। মুউ দেগেই ন'পারং। লাজাং। তেহ্ সালেন, গম মানুয কন্না? গম-মানুয অহ্ধে কি-কি গরা পরে? গম মানুয অহ্ল'দে সিবে, যিবে নিজে গুনর অহ্ভ' আ দেজ-জাদ' কামত্-ও গুনর লাগিব'। যিবেরে, নিজো জাদে চিনিবো, পিথিমিয়ানেও চিনিবো। আ, জাদরে পহ্র ছিদেই দি-পারিবো। জাদরে উগুরে তুলিবো, ভালেদ্ গোরিব।

আ, মানেয় জিংকানীত্, লেঘাপরা, চাগুরি, পোজাপিরে, উরোন-পিনোন, দোল ঘর, মাহ্ঝনি, ধন-সম্পত্তি ইয়েনি দ' হাক্কন্যে। মরি গেলে ইয়েনি, নিজোর ন'থায়, নিজো লগে নি ন'পারে। নিজো লগে ভজ্ নেযেই ন'পারে। মুরিলে-ইয়েনি নানু হোলেই ন'পারে, মনে কহ্লে কাররে দিও যেই ন'পারে। মানুয মাত্তর ইয়ত বাদি। গম্-কাম গরি ন'তাঙরি, গরিবার পুরি ফেলেই। মাত্তর, বজং কামত্, অগুনর কামত্ আজের ন'থেই। বজং কাম, অগুনর কাম গত্তে গত্তে, বেল আহ্লে যায়। তেহ্, মনতদুগে পোত্তে পোত্তে থেই। কিয়েত্ রদবল ফুরেই যায়। কিয়েত্ নানাগান ব্যাধি আবুজে। মন' পিরে, কিয়ে পিরে-লোয় পরান ইত্তুক অহ্য়। আত্থে-আত্থে মনান চিগোন অয়। তে, মানেয়' মনত মরন' চিদে ছমে। অক্ত এলে মরা পরে।

জিংকানীর মোন-মুরো উত্থে উত্থে, লাঙেল বে-বেই আ থল্-পথ আহ্ত্তে আহ্ত্তে, কক্কেনে যে মর আওজর আহ্ঝানি থুম ওয় গেল', এক্কেনাও মুই থাহ্র ন'পেলুং। মনে মনে পোত্ত্যাঙর, ম' নাঙে দ' বেল আহ্লেইয়ে তে কি গরানা? একদিন দ' মুই মরি পেইম্। ম' পূও-ঝি, নাদিন-পুদিন, সংসমাজ্যে, ঘরবো, জাদ বেক্কুনরে ফেলেই যা পরিব। মর বেগভাগ জিংকানী দ' বে-থারত্ কাদি গেল'। কি পেলুং, কি দিলুং, কি গরিলং? আঙুলো-পাপ গনি-গনি বুরেই ন'এযং। আঙুলো পাবে ন'কুলেই, রুও-বাজেও তান্ ন' মানের। চোগ ফেলে-ফেলে চেই-থাং। চোগেঘুমে ন' ধরে। আবাদাগরি, মনত্ চিদে ফুদিল, আ-পানি ঢাল্যে দ' জিংকানী যেব গোই। মুরি গেলে কিও-জনে দ'আর মরে ইধোত্ ন' তুলিবাক। কন'দিন আর মরে ন' দেবাক। সেক্কে মর মাজারাও ন' থেব।

জিংকানী চিদে গত্তে গত্তে মুই, চোগেদি বানা হুয়ো হুয়ো আ আন্ধার দেগং। মুই জিংকানীর দিঘোল পধত্ সুধো-আহ্থে। মুই ইক্কে ইনপোজ্জ্যে জারত্ উত্ত্যেভুত্ত্যে। আঘে বানা মর, মরা-মরা শলঙান। আ! জিংকানীর-এ বেল ডুবোনি মাধানত্ মুই কি গরিম? কাম গোরিবের

অক্ত হোরেই যেইয়ে। গোরিবের চেলেও, মুই কিচ্ছু গরি ন'তাঙুরিম আর। ম' চেরোপালা, ডেনে বাঙে, পিজে-মুজুঙে, বঙপাদারে সা-গর কাম্ পরি আঘে। সেত্তেরা অয় জাগুলুগ-বদি আঘে। মুই চাং ইয়েনি বেক্কুনে খবর-পাধোক, সুক-পাধোক। মাত্তর, মর সেদাম ন'থেলেও, মুই মুরি গেলেও, ম' গুরোজন, সংসমাজ্যে দ' আঘন, থেবাক্। আঝাগরং, তারা ম' মন' আঝানি, পুরেই দি-পারিবাক। মুই তারারে নোনেই-গোরি কোজোলি গরিম। মুই গোঝেনত্তুন তারারে বর-মাগি দিম, তারা যেনে, মানেয়-জিংকানী গুনোর লাগেই পারন। দেজ-জাদ' কামত্ নাঙ-বাজেই পারন, পিচ্ছোল-গরি বাক্-থুম গরি যেই পারন।

মাত্তর, ইক্কিনে বেঅক্ত অহ্লেও, এ-সেরেন্দি সালেন মুই এক্কান চিগোন-কাম গরি পারং। সে কাম-আন অহ্লদে; জাদর ভালেদত্তেই কিজু-কধা, কোই-যানা, লিগি-যানা। জাদরে মন'কধা কোই যানা, সজাক গরানা, চেদন আনি দেনা। হালিক ইয়েনও মর সেদাম নেই। তুও মুই যিদ্দুর পারে কুজ-গরি আরেই দি চাঙর। মনত্ গঙ-তুলি কলম বোযেই-চাঙ। মাধাত্ কিচ্ছু ন' এযে। মন'রে বলে বলে উযুলেবার মনে ন' কহ্য়। তুও মরে মুই, কোজোলী গরঙ। সেদামে যা কুলোয় মরে মুই জঘা চাং। কেজান অহ্ভ? যা পারং-যিদ্দুর পারং ম' মন' বরগাঙত সাজুরি চেম। মত্তুন পরানে কহ্য়, ধারাজ গরে, নিআলসি গরি জাদ' কাম গরি যানা, জাদরে-পহ্র দেঘানা, সাঙেত্ দেনা, ভালেদি কামত্ বল দেনা। জাদত্তেই, যিয়েন পারে সিয়েন গরানা, ধাঙর-উনরে ইধোত্ তুলি দেনা। চিগোন-উনরে শিগেই দেনা, বর দি-যানা, কোচপানা আ কির্বে গরানা। জাদ'কাম আরেই দি-যানা, গোঝেই দি-যানা দ' ধাঙর-উনোর কাম। পিথিমিত্ জাদরে বাজেই রাগানা দ' জাদর ভালেদি কাম।

সালেন, আমি কিত্ত্যেই সংসারত এচ্চেই, কিত্তেই পিথিমিত্ জন্ম অইয়েই? যে পধে এলং সে পধে গেলং। মাহ্ল্যেং পাগানা খেই খেই-জিংকানী পাদারি গোরি মুরি গেলং। মানেই কুলত্ জন্ম অহ্লে-জাদ'সিধু, দেজ'সিধু বেক্কুনত্তুন নাঙ-রাগেই যা পরিবো। লেঘাপরা কিত্তেই, কাত্তেই? নিজোর আ জাদর চোগ-পহ্র অভাত্তেই। বানা বানা নিজো আলু নিজে কুরিহ্ খেলে ন' অহ্ভ'। জাদ' দুগত্ কানা পরিবো। জাদ' সুগত্ আহ্ঝা পরিবো। ন'অহ্লে জাদে, আমারে নাঙ ঘিনি ন' পারিবো। জাদর কাঙেল লদক-ধদক অহ্ভ'। জাদ'নাঙ আহ্ঝি যেব'।

ইক্কো জাদ ভালেদ অহ্ধে, নিজো ঘরপাদা থিদে লাগে, দেঝ্ লাগে। জাদ' মনজক্কা লাগে। জন গদে-গদে জাদ' কোচপানা লাগে। আ, জাদর পথ-ফোরেই দিয়্যা গম-গিরোজ লাগে। জাদ' ডরমর' রমসম' চেলা লাগে, গম লেঘাপরা-পারিয়ে লাগে, মাধাবলা কাবিদ্যাঙ লাগে। যিবেই জাদরে সোওর গোরি, জাদত-তুলি পারে। জাদরে উস্সো তুলি দি পারে। জাদরে ধাঙর-গরি যিন্দি মনে কয় সিন্দি নি পারে।

গম্-জাদ হোলেই পারিবার এয' আমার সেদাম নেই। এয' আমার কন' জায়-জুক্কল নেই। এয' আমি জাদ' কামত্ সং নেই। এয সং আমি যা ধগে তে সেত্তেরা ওই আহ্ঘি। এ

মাধানত্ আমা জাদত্ মহাপুরুষ দরকার। মাধা ডর'বলা পাত্তলি-ধুরিয়ে মানুষ দরকার। জাদর দুগকামত্ বাগত্-লামিবার অমকধ' কাম্মো মানেয় দরকার।

আমি ইক্কে চোগ থেইনেও, চোগ কান, দেগিনেও-ন'দেগি। আমি ইক্কে, কান-কাল, শুনিলেও ন'শুনি। আমার যুনি জাদ' কোচপানা থেধ', জাদ' জধাবল থেধ', এধক ভিলোন আমি বলপেয়ে-গরি গম-জাদ হোলেই পাত্তং। বারবো-গরি, নি-চিদে গরি থেধং। পিথিমি বুগোত্ নাঙ লিঘিদোং। যেধক ভিলোন আমি বুক পাদি এক কধায় উধি ন'পারিবোং, সেধক ভিলোন আমি আদ্দান্ন্যে, আত্তুবো ওই থে-পেবং। সেনত্তেই, আমাত্তুন গম-কধা, গম-কাম গরানাত্ আক্কেং ও-পরিবো। মিজে কধা, গাল মাদানা, ফাগারা বুদ্ধি, আপাদাচ্চে গব দেনা, চোগোলি গরানা, হিংসে-পিজুম মাধাত্তুন, মনত্তুন, নিগিরে-নিগিরেই ঝারি ফেলা পরিবো। মন ধাঙর ও-পরিবো। বরজন', বুরোবুরি কধা, দাঘকধা, আমল-দি কান্দ গরা পরিবো। জাদ' ভালেদ চিনে পরিবো, জাদ' দুগ-সুগ গমেদালে বুঝো পরিবো।

মুও কধালোই, জাদরে বরবাদ নেযেই, দিন কাদেই লাব্ নেই। জাদ অহ্লদে গুরো-বুরো, চিগোন-দাঙর, লেঙ-আদুর, কান-কাল, মিলে-মরদ, ভুল-চালাক, রাঙা-কালা, নেইয়ে-থাগয়ে বেক্কুন। কাররে ফেলেই ন'পারিব', বেক্কুনরে ফাগত্ ভরা পরিবো। জাদ' বজং-উনরেও গম বানা পরিবো। আমি এজ', জাদ' আঝল পথ সুক ন'পেই। পথ সুক ন'পাদে, আমি দিবুচ্চে-ঘুমোত্ ঘুর কারির, আমারে অরলে চাবের। আজল কাম ফেলেই জুধো কাম গরির। কাম গরি এক্কেনা, দেগেই ভঝ'মান। কধা কইয়ে সা-গর, গুনোর-কধা কোইয়ে নেই। গুনোর কাম গুরিয়ে নেই। আ, হাক্কেনে, আমারে-আমি গান্ঝা-কানি ঝাগেরেই দি। কভং এক্কান গুরিবোং এক্কান। শিমেই গাজত্ মনা-পোজ্জে পারা, নইদে কামত্ জাগুলুক-বদি কোল বাজেই।

উযু কধা, আমি অমকধ' পাদুরো, মন চিগোন, রিবেঙ-পজা। জাদ' কামত্ আমি মরন ডরেই। এক্কেনা ডর লাগেলে, পুনত্ মুরি বাজে-সং, গুই-ধাবা দি, ধেই যেই। ধাদে ধাদে পেত্তোমরা, পরান-ইত্তুক অইয়েই। আমি লরা খেইয়ে উরিঙ-চঙরা ধক। ধেই যাদে, কাত্তুন কন্না আক্কোয় পারে জিৎবাত চেই। যেনে-সেনে পরান বাজেবার চেই। সেনত্তেই আমি এজ' যে-নেই সে-নেই। এজ' সং কবাল-পরা জাদ ওই আঘি। কি গোরা পরিব' খবর পেনেইও ন-গোরি, খবর ন' পেই। এ মাধানত জাদ্ দার-ভাঙা অইয়ে। জাদরে চিৎপুরে পারা অইয়ে। ইক্কে আমা জাদ আলাঙ্খা অইয়ে। থেইনেও নেই-গোরি আঘি।

চেলে আমি একঝাগ। জাত-ভেইওর কন' রাত্ নেই। বঙপাদারে, যিন্দি যায়, সিন্দি পায়। মাত্তর, কাররে কিইয়ে বান্দোই গরিয়ে নেই। জাদ' কামত্ চেলে বল দিয়ে নেই। ডাগিলেও সমত্ দিয়ে নেই। কাররে কিইয়ে কোচ-পেইয়ে নেই। চিনিলেও ন' চিনোন। দেগিলেও ন' দেগন। কাররে কিইয়ে ন' মাদান। পাজারা ফারি যান। কাররে কিইয়ে ফাগত্ ন'ভরান। মরেও কনজনে ফাগত ন'ভরান। তেহ্, মুইও, কার' লগে সংপরি ন' পাং। কার' মন ন'

পাং। কার' বল ন' পাং। তেহ্, ম'মনে মুই থাং, ম'চিদে মুই গরং, দজত্তেই, জাদত্তেই। মন'সমার পেবার মনে কহ্য়, কাররে তোগেই সুক ন'পাং।

সেনত্তেই, মুই ইক্কে অঘুর নিবিলি শন্হলা, আগাব ভূই-ও কলগত্ গাই-গাই পরি আঘং। কায়কুরে কন'জন নেই। কন' রহ্-পাদাচ্ নেই। অলর, কান্-জুরো, চিক চিক্যে। চিৎ ন' ভিঝে, সুধো-মু গরি চেই আঘং। চেরোহিত্ত্যে অঘুর মোন-মুরো, গাজ-বাজ' তারুম বন। ফাওন-চোত মাচ্চে হরান্যে, দাঙ-দাঙ্যে পাগানা রোদ। গাজ' পাদা ঝুরি যেইয়ে, ছরা-গাঙ শুগেই যেইয়ে। পত্তমে-স্ববনে দেগং, এ-পিথিমিত বানা মুই গাই-গাই। ইক্কে, মরে কিইয়ে গম পেইয়ে, কোচ-পেইয়ে আ চিৎ-পুরিয়ে নেই। ম' মনত দুগত্ কিইয়ে সাঙেত্ দিয়ে নেই। আঝা গরং, জাদ' দুগ চেনেই মরে চিৎ-পুরিয়ে আ বাইনি গরিয়ে থেবাক। ম' কানানি রহ্ শুনিলে বেগে উযেই এবাক।

তুওদ' মুই লিগি যেম, ম'কধা, ঘরপাদা কধা, জাদ' কধা। মুই গোরি যেম, নিআলসি-গোরি, জাদ' ভালেদি কাম, জাদে দুগত্তুন ছরান পেবার কাম। এয', বাব-ভেই, মা-বোনলক, বেঘরে উজুলেই। জাদত্তেই, জন গদে-গদে কাম গরি, যে যিয়ান পারে, তে সিয়েন গরি যেই। সেনত্তেই আর, চোগ ফেলে ফেলে চেই ন'থেই, চোগো আগুন চে ন' থেই, রাঙাকালা স্ববন ন' দেগি, জাদর গম-স্ববন দেগি, গম-স্ববন ভাঙি।

এ মাধানত্, জন গদে-গদে জাদ' দুগকামত্, লামিবার অক্ত অইয়ে। ন'অহ্লে জাদ' মাধা লুঙি পরিব'। জাদ' নাঙে কিচ্ছু দেঘেই ন' পারিবোং। জাদরে কিচ্ছু গোঝেই দি যেই ন' পারিবোং। সেনত্তেই, তুই-মুই সজাগ ন'অহ্লে, তুই-মুই আমল ন'দিলে, উধো ন'ললে, গাই-গাই মুই, কারে উজুলেম, কারে কোজোলী গোরিম?

.....

*চাঙমা ত্রিপন তেইয়া, শিক্ষক, বনফুল আদিবাসী গ্রিন হার্ট স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর,ঢাকা

সুপ্রিয় তালুকদার

প্রসঙ্গঃ আরাকান উত্তর অঞ্চলের সাক অধিবাসীগণ

অধ্যাপক উ থোয়াইং শৈ খাইন কর্তৃক মায়ানমা ভাষায় লিখিত *রাখাইন ম্রক ফাক দেসা মাহ্ সাক তাইং রাং সাঃ ম্যা* গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় *আরাকান উত্তর অঞ্চলের সাক অধিবাসীগণ* নামে অনুবাদ করেছেন মং মং চাক। এই অনুবাদিত গ্রন্থটি ২০১৩ সালে মং মং চাক ও চাক ভাষা কমিটি, বান্দরবান সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত মূল গ্রন্থের লেখক কলেজের একজন অধ্যাপক, বিদ্বান ও জ্ঞানী-গুণি ব্যক্তি। কাজেই তাঁর লেখা অনুবাদিত গবেষণাকর্ম নিয়ে কোনরূপ মন্তব্য করা আমার উদ্দেশ্য নয় তবে এটা ঠিক যে যেকোন অনুবাদকর্মে উপলব্ধি (Feeling) যথাযথ (Suitable) না হলে অনুবাদকর্ম ম্লান হয়ে পড়ে।

অনুবাদক মং মং চাক গ্রন্থটির প্রারম্ভে 'অনুবাদকের দৃষ্টিতে' লিখেছেন যে কোন গবেষণা ছাড়াই লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ চাকমা ও দৈংনাকদেরকে (তঞ্চঙ্গ্যা) অনুমানের উপর সাক পরিচয় দিয়েছেন তার *চাকমা জাতি(১৯০৯)* নামক গ্রন্থে যা খুবই দুঃখজনক ও বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করেছেন প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান এবং তিনি ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষকে দোষারোপ করেছেন (*চাকমা ইতিহাস বিচার,* ১৯৯১)। অশোক কুমার দেওয়ানের লিখিত *চাকমা ইতিহাস বিচার (১৯৯১)* গ্রন্থের বরাত দিয়ে তিনি (অনুবাদক) আরও লিখেছেন যে সর্বশেষ সাক রাজা য়েংচ এর ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে পতন হলে ঐ সময় চাকমারা চট্টগ্রামে ছিলেন। সেখান থেকে তারা কালের আবর্তে মহিষখালি, রামু ও দক্ষিণ দিকে টেকনাফ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করেছেন। তারা নাফ নদী পার হতে না পেরে আবার উত্তর দিকে চলে আসেন। আরাকান রাজার সেনাবাহিনী নাফ নদী পার হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এখনো কক্সবাজার জেলায় রামুতে চাকমার কূল, রাজারকূল নামক জায়গা আছে। ইহা পরিস্কার যে চাকমারা ব্রহ্মদেশ-আরাকানে কোন কালে ছিলেন না। মায়ানমারের দৈংনাকদেরকে চাকমা মনে করে সাক লিখেছেন সতীশ চন্দ্র ঘোষ তার লেখা *চাকমা জাতি* গ্রন্থে যার কোন ভিত্তি নেই ইত্যাদি। এতে তিনিও অশোক কুমার দেওয়ানের লেখা *চাকমা ইতিহাস বিচার (১৯৯১)* গ্রন্থটিতে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক ভেবে খুবই ভুল করেছেন যা দুঃখজনক বটে। প্রকৃতপক্ষে অশোক কুমার দেওয়ান মায়ানমারে চাকমাদের সুদীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান, যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্থান-পতনের ঘটনা এসব কিছুই অস্বীকার করেছেন, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বের ইতিহাস যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা তিনি আবর্জনা, নিছক

কল্পনা, বানোয়াট ইত্যাদি বলে চাকমাদের হাজারোর্ধ বছরের অতীত ইতিহাস মুহূর্তে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। সকল দেশি-বিদেশি এবং স্বগোত্রীয় লেখক-গবেষকের মতামতের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করে তিনি নিজেই চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। এর চাইতে আর দুঃখজনক কী হতে পারে ? তার বিপরীত চিন্তাধারা সঠিক হবে এমনতো কোন কথা নয় বরং তার এই বিপরীত মন্তব্য হতে পারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

যাহোক, মায়ানমারের প্রাচীন ইতিহাস *U Kala Maha Razawin(Great History by U Kala)* গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে লেখক Shwe Lu Maung তার লিখিত Burma গ্রন্থে লেখেন, "The Tibeto-Burman group is believed to have consisted of three tribes, The Pyu, the Kanyan and the Thet (Chakma) ....." [১] Thet শব্দটি Thet-kya শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ যার অর্থ শাক্য । চাকমারা বামা বা বর্মিদের নিকট Sak বা Thek বা Thet নামে পরিচিত। Th বামা বা বর্মি ভাষায় ক্ষেত্রবিশেষে S উচ্চারণ হয়ে থাকে। অতএব Sak শব্দটি শাক্য শব্দের রূপান্তর তা একপ্রকার নিশ্চিত হওয়া যায়।

San Tha Aung লেখেন ``Chittagong Hill Tracts occupied an area of 5,200 square miles. It is situated between Arakan Hill Tracts on the East, Buthidaung and Maungdaw districts on the South, the Lushai Hills (Mizoram) on the North and Chittagong plains on the west.

It composed of three regions namely Bohmong Htaung, Thet Htaung and Palan Htaung. These regions have their own hereditary Chiefs called Bohmongree, the Thet mong and the Palan mong or Mong Raja. The Bohmong and Mong Raja and their people are of Arakanese descent, whereas the Chakma Raja or Thet mong and his people are Thets –one of the original races of Burma....." [2]

উল্লিখিত উদ্বৃতিতে Htaung অর্থ Circle বুঝিয়েছে যেমন Bohmong Htaung অর্থাৎ বোহ্‌মাং সার্কেল, Thet Htaung অর্থাৎ চাকমা সার্কেল এবং Palan Htaung অর্থাৎ মং সার্কেল। অতএব Sak বা Thet অর্থে চাকমা বোঝায় এবং তারা মায়ানমারের একটি আদি বা প্রাচীন জাতি। উল্লেখ্য যে মায়ানমারে বসবাসরত সরকারিভাবে স্বীকৃত (Recognized) ১৩৫টি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর (Ethnic groups) মধ্যে চাকমা (Sak or Thet) ও তঞ্চঙ্গ্যারাও (Doingnak) অন্তর্ভূক্ত। মায়ানমারে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যারা Doingnak নামে পরিচিত এবং তারা চাকমাদেরই একটি অংশ যা অনুবাদকের না জানার কথা নয়। কাজেই সতীশ চন্দ্র ঘোষ তার লেখা *চাকমা জাতি* (১৯০৯) গ্রন্থে সঠিক তথ্য দিয়েছেন যে তঞ্চঙ্গ্যা বা দৈনংনাকরা চাকমাদেরই (সাক/থেত) একটি অংশ যা কোনভাবেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা নয়

যদিওবা অনুবাদক মং মং চাক তা ইচ্ছাকৃতভাবে ভিত্তিহীন মনে করেন বলে প্রতীয়মান হয়।

আরাকানে (রাখাইন স্টেট) Maungdaw, Buthidaung, Myauk U, Kyauttaw, Minpyo, Paun Na Kyuing, Patat Wo ইত্যাদি Township এর বিভিন্ন গ্রামে বর্তমানেও চাকমা (Thet) ও তঞ্চঙ্গ্যারা (Doingnak) বসবাস করছেন বহাল তবিয়তে। মায়ানমারে অধিকাংশ চাকমা (Sak or Thet) মায়ানমাদের (বামা) সাথে মিশে গেলেও ২০ লক্ষের অধিক Thet (চাকমা) রয়েছে বলে জানা যায়। ইয়াংগুন শহরে তাদের সংখ্যা ১ লক্ষেরও বেশি হতে পারে। মায়ানমারের National Registration Card (N.R.C) এ তারা জাতিগত পরিচয় কেউ লেখে মায়ানমা বা বামা, আবার কেউ লেখে Thet বা Sak । রাখাইন স্টেটে বসবাসকারী চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা লেখে দৈননাক তা জানা গেল। অতএব অনুবাদক মং মং চাকের উক্তিটি "ইহা পরিস্কার যে চাকমারা ব্রহ্মদেশ -আরাকানে কোন কালে ছিলেন না " ডাহা মিথ্যা, মন গড়া, বিভ্রান্তিকর ও উস্কানিমূলক।

ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে Toungoo এবং আরাকানের রাজা যৌথ অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ বার্মার (মায়ানমার) পেগু (বেগু) রাজ্য দখল করেন। ঐ অভিযানে আরাকানি সেনাপতিদের মধ্যে চাকমা রাজাও (Thet min) ছিলেন। এই প্রসঙ্গে G.E Harvey লেখেন, ``A Thet min was among the commanders attacking Nandabaying in 1599. He (Thet min) drove off the Siamese who tried to join in looting Pegu."[3]

Chittagong Hill Tracts District Gazetteer এ উল্লেখ আছে যে, ``The Chakma King Mwun Tsni was driven out from Upper Burma in 1418, because of his alleged disrespect towards Buddhism. He took shelter at Ali-Kadam (Alaykhyoungdaung) under the Muslim Officer in the present Chittagong district. He settled the Chakmas at Ramu and Teknaf. [৪]

Francis Buchanan ১৭৯৮ সালে এই অঞ্চল ভ্রমণ করেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা, বসতি, জীবনযাত্রার প্রণালী, ভাষা, ধর্ম, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিজ চোখে যা দেখেছেন , যা শুনেছেন এবং স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসাবাদে যা অবগত হয়েছেন তা তিনি তার ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই তার প্রদত্ত তথ্যসমূহ গবেষণাক্ষেত্রে অনুমানের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল বিধায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তিনি লেখেন, "In the evening we stopped at Riang-ghiang-bak, a small Chakma village on our right.....They say that they are the same with the Sak of Roang or Arakan: That originally the came from that country ....."[৫]

উল্লিখিত সকল তথ্য প্রমাণ করে যে চাকমারাই সাক্ (Sak বা Thek বা Thet) এবং তারা বার্মা (মায়ানমার) - আরাকানে (রাখাইন স্টেট) অতীতেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

মোঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত তিব্বতি-বর্মি (Tibeto-Burman) দলভূক্ত পিউ, কাণ্যান ও থেতরা মায়ামারের প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের মিলনে-মিশ্রণে মায়ানমারের বৃহত্তম জাতি বামা বা বর্মিরা গড়ে উঠেছে বিধায় এই তিনটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী মায়ানমাদের (বামা বা বর্মি) পূর্বপুরুষ । এই প্রসঙ্গে Aung San Suu Kyi তার লিখিত *Freedom from Fear* গ্রন্থে লেখেন, ``The second wave of peoples to come into Burma after the Mons were the Tibeto-Burmans from the north. The Burmese, who today form the largest racial group in the country, believe that their early Tibeto-Burman ancestors were the Pyus, the Kanyans and the Thets...." [৬]

বর্তমানে পিউ ও কাণ্যানরা লুপ্ত (Extinct) । তারা সম্ভবত বামা বা বর্মি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে পুরোপুরি মিশে গেছে। সাক বা থেতরা বৃহত্তর জাতি বামা বা বর্মিদের সাথে মিশে গেলেও বংশানুক্রমে এখনো নিজেদেরকে সাক বা থেত নামে ডাকে এবং মায়ানমারে এই নামেই পরিচিত । এরা কারা ? চাক নাকি চাকমা ? এই বিষয়ে পর্যালোচনা করা যাক । আলোচনার সুবিধার্থে সাক বা থেতদেরকে দু'টি দলে বিভক্ত করা হলো যা নিম্নরূপ ঃ

ক. সাক-চাক

খ. সাক-চাকমা

ক.সাক-চাক

সাক-চাকরা নিজেদেরকে আসাক নামে ডাকে । কিন্তু কোন একসময় বামারা (বর্মি) তাদেরকে আ-বাদ দিয়ে সংক্ষেপে সাক ডেকেছে। সেই থেকে তারা সাক বা চাক নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং খ.দলভূক্ত সাক-চাকমা শব্দ বা নামের সাথে মিলে যায় যেটি একটি আকস্মিক (Coincide) ব্যাপার । তারা নিজেদের আসাক ভাষায় কথা বলে যা Jingpaw বা অন্যান্য কাচিন (Kachin) উপ-ভাষার মতোই তবে আরাকানি ভাষার প্রভাব থাকতে পারে। তাদের কোন বর্ণমালা নেই।

খ.সাক-চাকমা

সাক-চাকমারা চাকমা এবং বামা বা বর্মিদের নিকট সাক, বা থেক বা থেত (Sak or Thek or Thet) নামে পরিচিত যা উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যে প্রমানিত। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে যা বর্মি বর্ণমালার সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। রাখাইন স্টেট ব্যতীত মায়ানমারের থেত এবং বামা বা বর্মিরা একই ভাষাভাষী। মায়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব) অনুপ কুমার চাকমার কাছ থেকে কথা প্রসঙ্গে জানা যায় যে চাকমারা মায়ানমারে সরকারিভাবে (Officially) Thet নামে পরিচিত ।

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ থেকে ১১ দিন পর্যন্ত আমি মায়ানমার ভ্রমণ করি। ২১ ডিসেম্বর তারিখ মান্ডালে থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে চম্পকনগর পৌঁছি। মায়ানমা (বামা বা বর্মি) উচ্চারণে চম্পকনগরকে বলা হয় চাম্পানাগো বা সাবেনাগো। এটি ইরাবতী নদীর পূর্ব পারে অবস্থিত একটি পার্বত্য অঞ্চল। নদীর পশ্চিম পারে মালে বা মালি। বিখ্যাত গবেষক Pierre Bessaignet এবং অন্যান্য গবেষকগণ তাদের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে চম্পকনগরের অবস্থান যেভাবে বর্ণনা করেছেন বাস্তবে তা হুবহু মিল, কোন ব্যতিক্রম নেই। দোভাষীর মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসী বামা ও থেতদের সাথে কথা বলি। একজন বৃদ্ধ থেত জানান যে তিনি তার দাদার কাছ থেকে শুনেছেন অতীতে এখানে সাক (Thet) রাজা বাস করতেন। চাম্পানাগো শহরটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ভূমিকম্পের ফলে ধ্বংসাবশেষগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে এটি একটি গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই থেত (Thet)। এই চম্পকনগরের সাথে সাক-চাকদের কোনরূপ সম্পৃক্ততা নেই। অতএব মায়ানমারের এই চাম্পানাগো বা সাবেনাগো চাকমাদের আদিরাজ্যপট যা বংশানুক্রমে জানা যায় এবং উল্লিখিত পর্যালোচনাক্রমে ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে পিউ, কাণ্যান ও থেতরা (সাক-চাকমা) বামা বা বর্মিদের পূর্বপুরুষ।

তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. Shwe Lu Maung, *Burma,* Dhaka, 1989, p.2
২. San Tha Aung, The Mog or the Magh or the Arakanese of Bangladesh, *Rakhine Tazaung,* 1980, p.6 (A Journal published from Akyab)
৩. G.E Harvey, Bayinaung's living descendant, The Magh Bohmong, in the journal of the *Burma Research Society,* Vol-44, No 1, pp35-52, Rangoon, 1961.
৪. *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer,* Dacca, 1971, p.25
৫. Edited by Willem van Schendal, *Francis Buchanan in South east Bengal (1798),* Dhaka, 1992, p.104
৬. Aung San Suu Kyi, *Freedom from Fear,* London, 1991, p.45

.....

*সুপ্রিয় তালুকদার, বিশিষ্ট চাকমা ইতিহাস গবেষক ও পরিচালক(অবঃ), উসাই, রাঙামাটি

শিশির চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য চর্চা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি,খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান)। এ জেলাগুলোতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চগ্যা, ম্রো, খুমী, পাংখোয়া, খিয়াং, চাক, বম, লুসাই ও গুর্খা নামে ছোট ছোট জাতি সত্ত্বার বসবাস। এদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং স্ব স্ব সত্ত্বায় পরিচিত হতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যদিও নানা প্রতিকূল ও বৈরী পরিবেশ প্রতিবেশের কীর্তিনাশা স্রোতের প্রাবাল্যে তাদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ আজ হুমকির সন্মুখীন। আদিকাল থেকে জীবন ও জীবিকার মূল অবলম্বন হলো জুম চাষ। মূলত জুমকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন। জুম ও বন তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জুম ও বনকে নিয়ে প্রথাগত মূল্যবোধের চর্চা এতদিন পরম মমতায় লালন করে এসেছে। এ প্রথাগত মূল্যবোধের চর্চার প্রতি নিবিড় আনুগত্যই আজ তাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ জাতিসত্ত্বা গুলোর প্রত্যেকেরই প্রাচীন সাহিত্য রয়েছে। যেমন বিভিন্ন লোক কাহিনি, কিংবদন্তি,পালা (যেমন চাকমাদের–রাধামন-ধনপুদি পালা, চাদিগাঙ ছারা পালা ও লক্ষী পালা), বারমাসী(যেমন চাকমাদের–চান্দবী বারমাসী, কালেশ্বরী বারমাসী, মেয়্যাবী বারমাসী ও তান্যাবীর বারমাসী) ছড়া, ধাঁ ধা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি। এ প্রাচীন সাহিত্যগুলোতে প্রেম বিরহ ইতিহাস ধর্ম লোকবিশ্বাস সর্বোপরি জীবন ও জীবিকার কথা রয়েছে বিভিন্ন ভাবে। এ অমূল্য সাহিত্যগুলো লালন ও সংরক্ষণের অভাবে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। আজ যদি দায়িত্ব নিয়ে এগুলি সংরক্ষণ করা যেত তাহলে মূল স্রোতধারার সাহিত্যের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারত। এ অবহেলিত উপেক্ষিত অরক্ষিত ছোট ছোট জাতি সত্ত্বাগুলোর লুপ্তপ্রায় অমূল্য প্রাচীন সাহিত্য সম্ভার গুলি বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কি কেউ নেবেনা ?

পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক সাহিত্যের যাত্রা শুরু চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে। রাণী বিণীতা রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ জেলায় সর্ব প্রথম 'গৈরিকা' নামে একটি পত্রিকা বের হয় ১৯৩৬ সালে। এ পত্রিকায় লেখকেরা লিখেছেন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়। লেখকদের মধ্যে শ্রী অরুণ রায়, কোকনাদক্ষ রায়, প্রভাত কুমার দেওয়ান, সলিল রায়, শ্রী মুকুন্দ চাকমা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালে চুনিলাল দেওয়ানই 'ঘর দুয়ারত এইনেই ডাগের সিবা কন্না মরে' নামে প্রথম আধুনিক চাকমা কবিতা লেখেন। এ কবিতাটিই আধুনিক চাকমা সাহিত্যের ভোরের আকাশে প্রথম পাখির ডাক। তিনি চাকমাদের তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম চিত্রশিল্পী এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিনের সমসাময়িক ছিলেন। চুনিলালের পরেই শ্রী মুকুন্দ চাকমা 'পুরান কধা' এবং কবি সলিল রায়ের 'দূরত ন যেইচ সোরি' কবিতা দুটি গৈরিকায় প্রকাশিত হয়। কবি সলিল রায় বাংলা ভাষাতে ও অনেক কবিতা রচনা করেন। কবি অরুণ রায় ও বাংলা

ভাষায় অনেক কবিতা লিখেছেন। তিনি 'গৈরিকা' পত্রিকার সম্পাদনার সাথেও যুক্ত ছিলেন। 'গৈরিকা' পত্রিকাটি অনিয়মিত ভাবে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বেরিয়েছিল।

১৯৬২ সালে রাঙ্গামাটিতে প্রথম ছাপাখানা আনেন বিরাজ মোহন দেওয়ান। এ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করলো। ১৯৬৭ সালে বিরাজ মোহন দেওয়ানের সম্পাদনায় 'পার্বত্য বাণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখকেরা প্রায় অনেকেই বাংলা ভাষায় লেখালেখি করলেও কিন্তু তাদের লেখার বিষয় আশয় ছিল এখানকার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি। তবে শ্রী মুকুন্দ চাকমা, সলিল রায় ও বীর কুমার তঞ্চগ্যা কয়েকটি চাকমা কবিতা লিখেছেন।'পার্বত্য বাণী' পত্রিকায় যারা লিখতেন তাদের মধ্যে অধ্যাপক সি আর চাকমা, বঙ্কিম দেওয়ান, সলিল রায়, নোয়ারাম চাকমা, অগ্রবংশ, বিরাজ মোহন দেওয়ান, বীর কুমার তঞ্চগ্যা, সুশীল জীবন চাকমা, গিরীন্দ্র বিজয় দেওয়ান, সুগত চাকমা, তরুণ তপন দেওয়ান, প্রভাকর চাকমা,সত্য বিকাশ তঞ্চগ্যা, অধ্যাপক চিত্ত রঞ্জন চাকমা, কুমার কোকনাদক্ষ রায়, ললিত কুমার চাকমা, কার্তিক চন্দ্র তংঞ্চগ্যা, অমূল্য রঞ্জন চাকমা, যোগেশ চন্দ্র তঞ্চগ্যা, বরেন ত্রিপুরা, বিজয় কেতন চাকমা, মজেন্দ্র লাল চাকমা ও নিবেদিতা দেওয়ান উল্লেখযোগ্য।

১৯৭০ এ সুগত চাকমার(ননাধন) চাকমা কাব্যগ্রন্থ' রাঙামাত্যা' প্রকাশিত হলে চাকমা সাহিত্য অঙ্গনে এক নতুন জোয়ারের সৃষ্টি হয়। রাঙামাত্যা কাব্যগ্রন্থটির মধ্য দিয়ে চাকমা সাহিত্য একটি নতুন পথের দিকে যাত্রা শুরু করলো। ১৯৭১–৭২ এ জুমিয়া সাহিত্য চর্চা ও প্রসারের লক্ষে কয়েকজন উদ্যমি তরুণ জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর(জুভাপ্রদ) নামে সংগঠন গড়ে তোলে। জুভাপ্রদ নামে সমধিক পরিচিত এ সংগঠন থেকে অনিয়মিত বেশ কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন বের হয়। এ লিটল ম্যাগগুলোতে স্বভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রতি তরুণদের মাঝে প্রবল ঝোক যায়। ১৯৭৩ এ জুভাপ্রদের 'বার্গী' নামের এক লিটল ম্যাগে ফেলাজেয়া চাকমার'জুম্মবী পরাণী মর' নামে প্রকাশিত কবিতাটি ব্যাপক সাড়া ফেলে। আঙ্গিক, বিষয়, শব্দচয়ন ও চিত্রকল্পে কবিতাটি একটি অনিন্দ্য সুন্দর কবিতা। এ কবিতার মধ্যে দিয়ে চাকমা কাব্যভাষায় যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ের আরো কয়েকজন যেমন ননাধন চাকমা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চাকমা, পরিমল চাকমা, ভুরুং, বাসনা চাকমা ও সুহৃদ চাকমা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ এ ননাধন চাকমার 'রংধং' এবং দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমার 'পাদারঙ কোচপানা' নামে দুটি কবিতার বই বের হয়।

১৯৭৬ সালে এ. কে. এম মকছুদ আহমদের সম্পাদনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে 'সাপ্তাহিক বনভূমি'নামে প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় তবে ১৯৭৮সাল থেকেই পত্রিকাটি নিয়মিত বের হতে থাকে। ১৯৮৩ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'দৈনিক গিরিদর্পণ' পত্রিকা।এ দুটি পত্রিকাই সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। এ পত্রিকায় যাদের প্রথম হাতেখড়ি তাদের মধ্যে অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য কর্মী। এখানকার বিভিন্ন পত্রিকা,

প্রকল্পনা সাহিত্যঙ্গন, সাধারণ পাঠাগার কেন্দ্রীক ও বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি চর্চার মধ্যে দিয়ে বাংলাভাষী অনেকেই আজ স্বনামধন্য লেখক হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকের একাধিক বই ও বেরিয়েছে। অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা, মুজিবুল হক বুলবুল, শোভা ত্রিপুরা, শাহরিয়ার রুমী, শাওন ফরিদ, আজাদ বুলবুল, ভুঈয়া মোখলেসুর রহমান, মোহাম্মদ ইসহাক, শ.ম.মঈনুদ্দিন ও মঈনুদ্দিন ভুঈয়া উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি কবি মুজিবুল হক বুলবুলের' হরিৎনিসর্গ ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে।

১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতি সত্তাগুলোর সাহিত্য, সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষে গড়া এ প্রতিষ্ঠান প্রথম দিকে বেশ কিছু কাজ করেছে। বেশ কিছু প্রাচীন সাহিত্য যেমন পুঁথি, বারমাসীর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছে। 'গিরি নির্ঝর' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা এবং একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকাও বের হয়েছে। এ পত্রিকা গুলোতে বিভিন্ন জাতিসত্তার জীবন, জীবিকা,ভাষা ও তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু লেখা, লোক কাহিনি, কিংবদন্তি এবং বহু গবেষণা মূলক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যারা ভাবেন, চর্চা ও গবেষণা করেন তাদের জন্য এ পত্রিকাগুলো ছিল খোরাক যোগানোর ক্ষেত্র। এখান থেকে কয়েকজন লেখকের গ্রন্থও বেরিয়েছে। এ পত্রিকাগুলো এখন আর বের হয়না। বর্তমানে কোন গবেষণা কাজ ও নেই। কদাচিৎ দু একটি সংকলন বের হতে দেখা যায়। ১৯৮৮ সালে বান্দরবানে এবং ২০০৩ সালে খাগড়াছড়িতে ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট গড়ে তোলা হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, লক্ষ্য পুরণে কাজ হচ্ছে বলে মনে হয়না। জনবলের অভাব, অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তার অভাব এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ না থাকার কারণে এ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করতে পারছে না। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ইনষ্টিটিউট নামে পরিচিত।

১৯৮২ সালে রাঙ্গামাটিতে জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল আত্মপ্রকাশ করে। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ছোট ছোট জাতিসত্তা গুলোর ভাষা সাহিত্য ঐতিহ্য সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্যই এ সংগঠনের জন্ম। এ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকাশনা বের করেছে। এ সংকলন গুলোতে সম্ভাবনাময় তরুণরা সাহিত্য চর্চা করার অবারিত সুযোগ পেয়েছে। তরুণরা ছাড়াও স্বনামখ্যাত কবি লেখকেরাও এ সংকলন গুলোতে আগ্রহভরে তাদের লেখা ছাপিয়েছেন। তাদের মধ্যে ডাঃ ভগদত্ত খীসা, সুগত চাকমা ননাধন, শ্রী বীর কুমার তঞ্চগ্যা, রাজা দেবাশীষ রায়, বিজয় কেতন চাকমা, সুহৃদ চাকমা, ফেলাজেয়া চাকমা, হিরহিত চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, সুসময় চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা, শ্যামল তালুকদার, ঝিমিত ঝিমিত চাকমা, শান্তিময় চাকমা, তরুন কুমার চাকমা, হরি কিশোর চাকমা, মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সিং ইয়ং ম্রো, মংক্য শোয়েনু নেভী, মানস মুকুর চাকমা, বীর কুমার চাকমা, কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, জগৎ জ্যোতি চাকমা, লালন চাকমা,অম্লান চাকমা, হিরালাল চাকমা, লালপ্রেম চাকমা, সজীব চাকমা, সুখেশ্বর চাকমা, সীমা দেওয়ান, প্রগতি খীসা, কে ভি দেবাশীষ

চাকমা, রিপরিপ চাকমা, নিকোলাই চাকমা, মুক্তা চাকমা, দ্যানিস চাকমা, বারেন্দ্র লাল চাকমা, উ রাখাইন কায়েস, রনেল চাঙমা, রিপন চাঙমা, লিপিকা ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের অন্যতম শাখা নাটক রচনার ক্ষেত্রেও লেখকেরা গুরুত্ব পুর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। ১৯৭৮ সালে 'ধেঙা বৈদ্য' নামে প্রথম চাকমা নাটক লেখেন সুগত চাকমা। 'নীল মোন স্ববন' তার দ্বিতীয় নাটক। ১৯৮২ সালে ডাঃ ভগদত্ত খীসা 'অহ্য় নয় বৈদ্য' নামের নাটকটি লেখেন। চিরজ্যোতি চাকমা লেখেন 'আনাত ভাঝি উধে কা মু'। শান্তিময় চাকমা রচনা করেন 'যে দিনত যে কাল,''বিঝুরামর স্বর্গত যানা','আন্ধারত জুনি পহর','ঝরাপাদার জিংকানী,'। মৃত্তিকা চাকমার নাটক 'দেবঙসি আহ্ধর কালা ছাবা,''গোঝেন,' মহেন্দ্রর বনভাঝ,' 'এক জুর মান্নেক,' 'জোগ্য,' 'হককানীর ধনপানা,' 'এগাত্তুরর তরনী,' 'ভুত'। ঝিমিত ঝিমিত চাকমার 'অদত', 'আন্দলত পহর', 'কাত্তোন', 'অঈনজেব', 'হাজারী মু বাহ', 'ফিরিঈ' উল্লেখযোগ্য।

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি প্রায় এক দশকেরও বেশী সময় ধরে সাহিত্য চর্চা ও প্রকাশনা নিয়ে কাজ করে আসছে। এ পর্যন্ত ত্রিশ এর অধিক সংকলন বের করেছে তারা। এ সংকলন গুলোতে তরুণদের লেখালেখি চর্চার পাশাপাশি স্বনাম খ্যাত লেখকদের লেখাও প্রকাশিত হচ্ছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তারাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

১৯৯০ সাল থেকে চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া ও হাফিজ রশিদ খানের সম্পাদনায় বান্দরবান থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে লিটল ম্যাগাজিন 'সমুজ্জ্বল সুবাতাস'। 'সমুজ্জ্বল সুবাতাস 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম একমাত্র লিটলম্যাগ যেটি এক নামে একনাগাড়ে বের হচ্ছে। এর সম্পাদক নিরলস পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র প্রদত্ত 'লিরিক সন্মাননা–২০০০ এবং জাতীয় লিটল ম্যাগাজিন মেলা উদযাপন পরিষদ সন্মাননা ২০১০ অর্জন করেছেন। সমুজ্জ্বল সুবাতাসে বান্দরবানের ম্রো, খুমী, খিয়াং, চাক, বম ও মারমা জাতিসত্তার ভাষা ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং তাদের বৈচিত্র্যময় জীবন ধারা সম্পর্কে লেখা প্রকাশ পাচ্ছে। তবে মারমা ও ম্রো ছাড়া খুমী খিয়াং চাক এবং বমদের স্বভাষায় সাহিত্য চর্চা চোখে একটু কমই পড়ে। এ ম্যাগাজিনে যারা লিখছেন তাদের মধ্যে ক্য শৈ প্রু খোকা,মংক্য শোয়েনু নেভী, সিং ইয়ং ম্রো, মং সিং ঞো, সি অং খুমী, লেলুং খুমী, চাই সুইহ্লা মারমা, অনিল তঞ্চগ্যা, অংসুই মারমা, অং শৈসিং মংরে, মং মং চাক, পাই থুই চাক, বীর কুমার তংঞ্চগ্যা, মং শৈ চিং চাক, বাছা খিয়াং, শাওন ফরিদ, বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, প্রভাংশু ত্রিপুরা, মনিরুল ইসলাম মনু,হাফিজ রশিদ খান, চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া উল্লেখযোগ্য ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য চর্চা মূলত লিটল ম্যাগাজিন কেন্দ্রিক। সেই দিক থেকে বলতে গেলে লিটল ম্যাগাজিনই হল সাহিত্যের প্রাণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর সময় কাল থেকে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে এ যাবৎ অনেক লিটল ম্যাগাজিন বেরিয়েছে। এ ম্যাগাজিন গুলোর মাধ্যমেই পার্বত্য

অঞ্চলে যে সাহিত্য চর্চা হয়েছে বা হচ্ছে সে কথাই এতক্ষণ তুলে ধরলাম। এ ম্যাগাজিন গুলোতে এ অঞ্চলের মানুষের সূখ দূঃখের চালচিত্র ফুটে উঠেছে।

১৯৬০ সালে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে প্রায় ১,৬৪,৮৪০ একর চাষ যোগ্য জমি জলে ডুবে যায়। হাজার হাজার মানুষ ভিটে মাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। অনেকে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়। এ ভিটে মাটি হারানো মানুষদের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দূঃখ। এ দূঃখময় জীবনের কথা অনেকে তাদের কবিতা, গল্পে ও নাটকে টেনে এনেছেন। স্বাধীনতাত্তোর অর্থাৎ পচাত্তর পরবর্তী সময় কাল পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ক্রান্তিকাল। এ অঞ্চলে দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রাম, দেশের অন্য জেলা থেকে ব্যাপক হারে লোক আনা, জায়গা জমি হারানো, মানবাধিকার, সহিংসতা, জাতিগত আত্মপরিচয়, অস্তিত্বের সংকট, প্রথাগত জীবনাচরনের মূল্যবোধে আঘাত, সর্বোপরি বিরাজমান চরম অস্থিরতা ও হতাশার এ বিষয় গুলো ঘুরেফিরে লেখকদের লেখায় ওঠে এসেছে।

পার্বত্য অঞ্চলের সাহিত্য চর্চা বর্তমানে যে ধারায় এগুচ্ছে তা আশাপ্রদ বলা যায় না। তাই সাহিত্য চর্চার এ ধারাকে এগিয়ে নেওয়া এবং গতিশীল করার জন্য সরকারের অনেক দায়িত্ব ও করণীয় আছে। যেমন পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলায় যে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ইনষ্টিটিউট গুলো আছে সেগুলো সংস্কারের বিষয়ে ভাবতে হবে। দক্ষ জনবল ও অর্থ বরাদ্ধ বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া। যাতে এ প্রতিষ্ঠান গুলো থেকে গবেষণা কাজ, নিয়মিত পত্রিকা, গবেষণা পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারে সে জন্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য চর্চার পরিসর ও পরিধি বাড়াতে বাংলা একাডেমীরও যথাযথ ভূমিকা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। বাংলা একাডেমিতে ছোট জাতিসত্ত্বা গুলোর ভাষা সাহিত্যের জন্য একটি আলাদা বিভাগ থাকা দরকার। এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছোট জাতিসত্ত্বার সাহিত্য অনুবাদ করে তা প্রকাশের ব্যাবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তাহলে এ অঞ্চলের সাহিত্য মূল স্রোতধারার সাহিত্যের সাথে যুক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ প্রস্তাব কি বিবেচনা করা যায় না?

(১৫ সেপ্টেম্বর,২০১৩ তারিখে রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে বাংলা একাডেমী আয়োজিত আঞ্চলিক সাহিত্য সন্মেলনে পঠিত।)

.....

*শিশির চাকমা, বিশিষ্ট কবি, শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় ও নীতি নির্ধারণী কমিটি, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক)।

মনোজ বাহাদুর

মঞ্চ নাটকের ডিজিটাল ধারণা

নাটক মঞ্চায়নের কথা বললেই আমার ছোট বেলার যাত্রা পালার কথা মনে পড়ে। চর্তুদিকে দর্শক মাঝখানে মঞ্চ। মঞ্চের একপাশে হারমোনিয়াম, তবলা, বিউগল ও ক্লারিওনেট ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র নিয়ে আবহ সঙ্গীত প্রদানের জন্য বাদকরা বসা। অভিনয় শিল্পীরা অনর্গল ভাবে তাদের সংলাপ বলছে। যার যার চরিত্রের বিষয়ে তাদের মধ্যে যে একাগ্রতা দেখেছি তা এখন ভাবতে অবাক লাগে। যাত্রায় সংলাপ বলার ভঙ্গিও ছিল অন্যরকম। বর্তমান সময়ের সাউন্ড বা মাইক এসব কিছু তখন ছিল না তাই যাত্রা দেখতে আসা শেষ সারির দর্শক ও যাতে শুনতে পায় সে জন্য জোর গলায় অনেকটা চিৎকার করে তাদের সংলাপ বলতে হতো। তবে মঞ্চের একপাশে অভিনীত যাত্রাপালার বই নিয়ে একজনকে সংলাপ বলার ক্ষেত্রে অভিনয় শিল্পীদের সহায়তা করার দৃশ্য ও আমি লক্ষ্য করেছি।

তাদের এই অভিনয়ের ধারা বছর বছর দর্শকরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। গ্রামে গঞ্জে আরো বহু ধরনের লোকজ সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল। যেমন কবিগান বা কবির লড়াই, পালাগান, পুথি পাঠ, কীর্তন ইত্যাদি। সেসব অনুষ্ঠানেও অভিনয় থাকতো। তার কারণ সাধারণ শ্রোতা দর্শক যে কোন বিষয় অতি সহজভাবে বুঝতে চায়। কাহিনী বর্ননার সাথে যদি অভিনয় সংযোজন করা হয় তবে সেটি আরো বেশী সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

আধুনিক মঞ্চ নাটকের বিষয়ে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। আমি আধুনিক নাটকের গ্রামার বুঝি না। সে বিষয়ে আমার পড়া লেখাও নেই। প্রতীকি অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারি না কারন আমি একজন সাধারণ দর্শক শ্রোতা। আমি আকাশ কে আকাশ দেখি, সূর্যকে সূর্য দেখি, চাঁদ কে চাঁদই দেখি। আমি কালো মেঘ দেখে কোন রমনীর ঘন কালো চুল ভাবতে পারি না। বৃষ্টির শব্দে আমি কোন রমনীর পায়ের নুপুরের আওয়াজ শুনি না। কারন আমি আবার বলছি আমি একজন সাধারণ দর্শক শ্রোতা।

আমি গানের লোক হলেও নাটক আমার ভাল লাগতো। ছোট বেলায় আমার ফিলিপস রেডিওতে গুনা তারের এন্টিনা লাগিয়ে বিকেল ৪টায় কলিকাতা খ কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শ্রুতি নাটক গুলো প্রায়ই শুনতাম। তবে নাটকের আওয়াজ আসতো ঢেউয়ের মত। রাঙ্গামাটিতে ঢাকা বেতার শোনা যেত না। চট্টগ্রাম বেতার পরিস্কার ছিল তবে নাটক প্রচারের ক্ষেত্রে তারা খুব একটা যত্নবান ছিলেন বলে আমার মনে হয়নি। আর কোলকাতা

খ কেন্দ্রের নাটক শোনার পেছনে কারণ ছিল, তারা সমরেশ মজুমদার,নীহারঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ উপন্যাসিকদের জনপ্রিয় কাহিনী গুলোকে নাটক বানিয়ে প্রচার করতো। আর দেশ পত্রিকার মাধ্যমে নানান লেখকের লেখাগুলো পড়ার সুযোগ ছিল। বই আকারে বেরোবার আগেই তাদের অনেক লেখা খন্ড খন্ড করে দেশ পত্রিকায় ছাপনো হতো। রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরীর মেম্বার হিসেবে প্রতি নিয়ত নূতন নূতন বই পড়ার সুযোগ ছিল। তখন বই পড়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ তখন টেলিভিশন ছিল না। গান শোনার জন্য ৭৮ স্পিডের গ্রামোফোন ছিল। আমি ক্যাসেট প্লেয়ার কিনেছিলাম সম্ভবত ১৯৭৭ সনে।

কোলকাতার নাটকের বিশেষত্ব ছিল তারা শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে দিত নাটকের দৃশ্যটা কোথায়। যাতে শ্রোতার কাছে ঘটনাটা স্পষ্ট হয়। আমি নাটক শোনার সময় চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতাম আর নাটকের দৃশ্যটি আমি মনের পর্দায় দেখতে পেতাম। আর সে সব নাটকে যে কোন বীর, শান্ত বা গম্ভীর আবহের সময় বিবেচনায় নিয়ে যথার্থ মিউজিক প্রয়োগ করা হতো। তারা নাটকের আবহ সঙ্গীতের উপর অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ক্যাসেট প্লেয়ার কেনার পর ভানু বন্দোপাধ্যায়ের নানান কৌতুক, বিরাজ বৌ,শেষের কবিতা ইত্যাদি শ্রুতি নাটক সহ, নানান শিল্পীর আবৃতি শোনার সুযোগ হয়েছিল ।

ছোটবেলায় স্কুলে মাঝে মাঝে গান পরিবেশনের পাশাপাশি অভিনয় করতে হতো। আমাদের একজন বাংলা শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমাদের দিয়ে এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তিনি আমাদের দিয়ে অভিনয় করালেন মাইকেল মধুসূধনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মেঘনাদ বধ কাব্যের অংশ বিশেষ। আমি হলাম মেঘনাদ। আমার সংলাপ শুরু হলো " জানিনু কেমনে আসি লক্ষণ পশিল রক্ষপুরে, হায় তাত উচিত কি তব এই কাজ? ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সংলাপ আমাকে অনর্গল মুখস্ত করতে হয়েছিল, তখন শিক্ষকরা কথায় কথায় বেত চালাতেন। বেতের ভয়ে আমার মুখস্ত বিদ্যার জোর বেড়ে গিয়েছিল। একই অবস্থা হয়েছিল আমার অন্যান্য সঙ্গীদেরও। আমার বাবা যাত্রা পালায় অভিনয় করতেন। বাসায় আমার বাবাকে ডায়লগ মুখস্ত করতে দেখেছি। আমি সেই ছোটবেলা থেকেই এসব বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। আমার দিদি মঞ্জু রানী গুর্খা কণ্ঠ শিল্পী হলেও তিনি রাঙ্গামাটির বহু নাটকে অভিনয় করেছেন।

১৯৭৮ সনের শেষের দিকে আমি চাকুরী সুত্রে খাগড়াছড়িতে বদলী হই। খাগড়াছড়ি তখন জেলা হয়নি মহকুমা ছিল। সেখানে পরিচয় হয় জনাব ইব্রাহিম খাঁ নামে একজন নাট্য ব্যক্তিত্বের সাথে। আমি মহকুমা শিল্পকলা একাডেমীর ব্যানারে তখন তার সহায়তায় খাগড়াছড়িতে নাট্য চর্চা শুরু করি। একে একে মঞ্চায়ন করি কল্যান মিত্রের চোরা গলি মন,আশকার ইবনে শাইখ এর ফকির মজনু শ্াহ সহ আরো বহু নাটক।

আমার প্রিয়জন তারকালোক পত্রিকার সত্বাধিকারী আরেফিন বাদল তার সাইট এন্ড সাউন্ড এর প্রযোজনায় একটি সিরিজ নাটক তৈরি করেন। নাম ইমু বাবু। পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব দারা শিকো। সেই নাটকে আমি নায়িকার পিতার চরিত্রে অভিনয় করি। নাটকটি এটিএন ও বিটিভিতে প্রচারিত হয়েছিল।

আমি বিটিভি হতে প্রচারিত এই সব দিন রাত্রি, সংশপ্তক ও অন্যান্য সিরিজ নাটক গুলোর জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করে এটুকু উপলব্ধি করেছি যে নাটক গুলো সহজ ভাবে একজন সাধারণ দর্শক শ্রোতার কাছে যাতে গ্রহনযোগ্যতা পায় ঠিক সে ভাবে বানানো হয়েছিল। তখন নাটকে যারা অভিনয় করতেন তারা চরিত্রের গভীরে যেতেন, যারা নাটক বানাতেন তারাও ধৈর্য সহকারে অভিনয় শিল্পীদের কাছ থেকে বেস্ট পারফরমেনসটি আদায় করে ছাড়তেন। এখন টিভি চ্যানেলের সংখ্যা যেমন বেড়েছে নাটকের সংখ্যাও বেড়েছে তার সাথে সাথে পরিচালকের সংখ্যা ও বেড়েছে। শোনা যায় অনেক পরিচালক একশন, রোল এ দুটি শব্দ ছাড়া আর তেমন কিছু করেন না। অভিনয় শিল্পীর অভিনয় শুধরে দেয়ার মত বা অভিনয়টি কি ভাবে করতে হবে সেটি যদি পরিচালক দেখিয়ে দিতে না পারে তবে ভালো নাটক কি ভাবে বানানো সম্ভব। আবার এ ও শুনেছি যে অনেক নাটকের নাকি স্ক্রিপ্ট বা কোন কাহিনী থাকে না। নাটক বানানোর সময় নাকি সহ শিল্পীদের পরামর্শে কাহিনী তৈরি হয় ও উপস্থিত ভাবে নাটক শুট করা হয়। জানি না আমার শোনাটা সঠিক কিনা।

আমি গত কিছুদিন আগে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিগিরি নাটক দুটি রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে মঞ্চস্থ করেছিলাম। আমি প্রথমে নাটকের সংলাপ গুলো মঞ্চে অভিনয়কারী শিল্পীদের মঞ্চে প্রবেশ ও বের হওয়ার টাইমিং মিলিয়ে রেকর্ড করি। সেই রেকডিং ট্রাকের সাথে সিকোয়েন্স অনুসারে মিউজিক সংযোজন করি। সেই ট্রাক বাজিয়ে আমি অভিনয় শিল্পীদের মহড়া করাই। এর ফলে নাটকের ডায়লগ ও আবহ সঙ্গীতের এডিট করা সমন্বিত সাউন্ড দর্শকদের ভালো লাগে তারা কিছুটা সিনেমা দেখার আমেজে নাটক উপভোগ করে তাছাড়া দৃশ্য পরিবর্তনের সময় যে বিরক্তিকর বিরতি থাকে সেটি মিউজিক দিয়ে আমি মিলিয়ে দেই। ফলে নাটকটি বিরতি ছাড়া শেষ হয়। সাধারণ দর্শক শ্রোতা মন্ত্র মুগ্ধের মত সেই নাটক দুটি উপভোগ করে এবং অনেকে ইমোশনাল হয়ে যায়। সেটি আমি বুঝতে পারি কারণ নাটক শেষ হওয়ার পর অঞ্জুলিকা দি ও নিরূপা দি সহ আরো অনেকেই আমার সেই ডিজিটাল নাটকের উচ্ছসিত ও আবেগপ্রসুত ভঙ্গিতে প্রশংসা করেন। আমি লক্ষ্য করি যে হলের সাধারণ দর্শক শ্রোতারা আমার নাটকের বিশেষ বিশেষ মুহুর্তে তুমুল করতালি দিয়ে ও বিভিন্ন মন্তব্য, এমনকি চিৎকার করে নাটকের পজিটিভ চরিত্রের পক্ষ নেয় ও নেগেটিভ চরিত্রকে গালমন্দ করে। আমি বিষয়টি বেশ এনজয় করি। দর্শক শ্রোতাদের আমি সিনেমার স্বাদ দিতে পেরেছিলাম বলেই হয়তো এটি সম্ভব হয়েছিল।

সাধারণ মঞ্চ নাটকের দর্শকপ্রিয়তা হারানোর অনেক গুলো কারণ আছে। কারণ গুলো বর্ননা করার আগে একটি বাস্তব ঘটনা বলি। ঢাকা শিল্পকলা একাডেমীর "স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত নাট্য মঞ্চায়নের" কর্মসুচির আওতায় সম্ভবত গত বছর ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমীর নবনির্মিত নাট্য মঞ্চে ৭তলায় রাঙ্গামাটির নাট্য দল নিয়ে নাটক মঞ্চায়ন করি। সেখানে দর্শক শ্রোতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। আমাদের দর্শকরা ছিলেন, যারা আমাদের পরে নাটক করবেন সেই নাট্য দলের সদস্যরা। আমদের নাটক শেষ হতেই তারা আমাদের অনুরোধ করলেন আমরা যাতে তাদের নাটকের সময় দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকি। আমি জানি না ঢাকার অন্যান্য মঞ্চে নাটকের সময় এধরনের হয় কি না? যা হোক বিষয়টি আমাদের জন্য বেদনাদায়ক। দিনের পর দিন মাসের পর মাস রিহার্সাল করে, মগজ খাটিয়ে শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে বানানো নাটক মঞ্চায়নের সময় যদি দর্শক না থাকে তখন মন ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক।

মঞ্চ নাটকের সামনে এখন অনেক চ্যালেঞ্জ। বর্তমান আকাশ সংস্কৃতি, গ্লোবাল ভিলেজের যুগে টিকে থাকার জন্য সকলেই নূতন নূতন উপায় খুজে নিচ্ছে। সিনেমা, যাত্রা যেমন টিকে থাকছে না, মঞ্চ নাটকের অবস্থা ও তাই। টিকে থাকার জন্য এখনই কৌশল খুজতে হবে। ডিজিটাল পদ্ধতির নানা সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সারা বিশ্বে মঞ্চের অনুষ্ঠান গুলোকে কি ভাবে দর্শকদের মাঝে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটি আমার বর্ননা করার প্রয়োজন নেই। সারা দিনই বিভিন্ন ডিশ চ্যানেলগুলো এসব ডিজিটালি নির্মিত মঞ্চ অনুষ্ঠান গুলো প্রচার করে যাচ্ছে। আমরা কেন বোকার মত পুরাতন ধ্যান ধারণার ধুয়ো তুলে পিছিয়ে থাকবো। এতে কি কোন লাভ হবে? নিশ্চয় নয়। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে আমরা একসময় হারিয়ে যাবো।

সংলাপ রেকর্ড করা আমাদের সেই নাটকটির একটি প্রদর্শন হয় চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমী উন্মুক্ত মঞ্চে। আমাদের নাটকের আগে অন্য একটি নাট্যদল নাটক উপস্থাপন করে। স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্চের উপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়া মাইক্রোফোন গুলোতে অভিনয় শিল্পীদের সংলাপ বলার শব্দ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় দর্শকদের কানে আসে, যিনি মাইক্রোফোনের কাছে থাকেন তার শব্দ হয় জোরে আর অনেকের ডায়লগ শোনাই যায় না। আর রাইফেল নিয়ে যিনি গুলি করার অভিনয় করছেন তার গুলির শব্দ আসলো অনেক পরে। দর্শকরা এত অসামঞ্জস্য কত আর সহ্য করবেন। আগে যেমন বাংলাদেশে একটি মাত্র টিভি চ্যানেল ছিল তখন টিভি কর্তৃপক্ষ যা দেখাতো তাই বাধ্য হয়ে দেখতে হতো। এখন কি সেই সময় আছে? এখন রিমোটের এক টিপে পছন্দের চ্যানেলে আমরা ঢুকে যাচ্ছি। যে চ্যানেল ভালো সেই চ্যানেল জনপ্রিয় হচ্ছে। নাটকের ক্ষেত্রেও তাই সময়ের চাহিদা পূরন করতেই হবে। আমি অনেক বিজ্ঞ জনকে দেখেছি মঞ্চ নাটক দেখতে না আসা আমার মত সাধারণ দর্শকদের গালি দিতে। আমি অনুরোধ করবো গালি না দিয়ে আসুন কিভাবে আমাদের

নিজস্ব ঐতিহ্যকে গ্লোবালি পছন্দের পদ্ধতিতে পরিবেশনের মাধ্যমে নাটককে দর্শকপ্রিয় করার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারি সেই চেষ্টা করি।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সকলেই দৌড়াচ্ছে। আমরা কি করবো সেটি ভেবে দেখার বিষয়। যা হোক এর পরে আমাদের ডিজিটাল নাটক মঞ্চায়ন হলো এডিট করা, প্রসেস করা, ডায়লগ, উচ্চমানের আবহ সঙ্গীত, সাথে আমাদের অভিনয় শিল্পীদের নিখুত লিপ্সিং এবং বিরতিহীন উপস্থাপনা। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মত আমাদের নাটক উপভোগ করলো। তারা কেউই বুঝতে পারলো যে এটি ডিজিটালি করা। কিন্তু পুরাতন ধ্যান ধারনার কিছু তথাকথিত নাট্য ব্যক্তিত্ব এই বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারলেন না। তারা বললেন এটি মঞ্চ নাটকের ফর্মুলার মধ্যে পড়ে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারা পরিবর্তনকে ভয় পান। কিন্তু সাধারণ দর্শক শ্রোতার কাছে আমাদের নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তবে তথাকথিত নিয়মের কথা বলে আমরা আমাদের ডিজিটাল নাটকটি ঢাকায় আমাদের মত করে মঞ্চায়ন করতে পারিনি।

আমার প্রশ্ন? আমি নাটক বানাবো কার জন্য। নিশ্চয় আমার টার্গেট হবে সাধারণ দর্শক। সাধারণ দর্শক যদি আমার নাটক পছন্দ করে তবে অবশ্যই আমি স্বার্থকতার দাবীদার। আমি মনে করি কোন নিয়মের বেড়াজালে বন্দী হয়ে যা কিছুই হোক কিন্তু সংস্কৃতি করা যাবে না। সৃষ্টিশীল মনের ভাবনা, চিন্তা কোন রীতি নীতির তোয়াক্কা করে না। দশ ঠাটের বেড়াজাল ভেঙেও অনেক বেনামী রাগ, সুর, গান সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন স্কুল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা পড়া করলে তিনি বিশ্বকবি হতে পারতেন কিনা আমার সন্দেহ হয়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আমাদের লোকজ সঙ্গীতের ভান্ডার নিশ্চয় রাগ রাগিনীর সুত্র ধরে সৃষ্টি হয় নি। আজ যেটি সত্যি সেটি কাল মিথ্যা হতে পারে। সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্য এবং পৃথিবীসহ সকল গ্রহ এই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এই সত্যি আবিস্কার করার জন্য গ্যালিলিও কে জীবন দিতে হয়েছিল। কারণ তখন সকলেই জানতো যে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র।

আমার ডিজিটাল ধারণাকে যারা সমালোচনা করেন আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই, আগে তো পেট্রোম্যাক্স অর্থাৎ মেন্টল লাইট জ্বালিয়ে নাটক বা যাত্রা পালা হতো এখন আধূনিক প্রযুক্তির লাইট কেন ব্যাবহার করছেন। আগে একটি মঞ্চে নাটক হতো এখন রিভলভিং প্লাটফর্মে একের অধিক মঞ্চ কেন ব্যবহার হচ্ছে। মঞ্চ নাটকে মিউজিকের ক্ষেত্রে লাইভ কেন বাজানো হচ্ছে না, কেন মিউজিক ট্রাক ব্যবহার করছেন?

যারা নাটকের তথাকথিত নিয়মের বেড়াজাল ভাঙতে চান না তাদের কাছে আমার অনুরোধ অন্তত নাটকের সংলাপ যাতে উচ্চকণ্ঠে (মঞ্চ নাটকে উচ্চ কণ্ঠে সংলাপ বলতে হয়) না বলে আবেগের সাথে, রাগের সাথে, যথোপযুক্ত টোনে বলা যায় ও মঞ্চ নাটকে অভিনয় শিল্পীদের সংলাপ সুস্পষ্ট ভাবে যাতে শোনা যায় সে জন্য এক নুতন পদ্ধতির কথা আমি শুনেছি। সেটি হচ্ছে অত্যাধুনিক সাউন্ড টেকনোলজির ওয়ারলেস মাইক্রোফোন। প্রতি শিল্পীর বুকে মুখের কাছে ছোট্ট মাইক্রোফোন লাগিয়ে নাটকের মান বাড়ানো যেতে পারে। তবে আমরা যারা মফস্বলে থাকি তাদের জন্য এটি ব্যয়বহুল। তবে এই ব্যবস্থায় নাটক উপস্থাপিত হলে নাটকের মান ও জনপ্রিয়তা পুনঃবৃদ্ধি পাবে আর তথাকথিত নিয়ম কানুনও ভঙ্গ হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

.....

* মনোজ বাহাদুর, বিশিষ্ট আদিবাসী গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী।

আনন্দমিত্র চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামঃ বর্তমান আদিবাসী খন্ডচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এক নৈসর্গিক লীলাভূমি। এ অঞ্চলে কালে যত আগন্তুকের আগমন ঘটেছে তারা আকর্ষিত হয়েছে, এক সময় এ অঞ্চলে থেকে গিয়ে মিশে গেছে আবহাওয়া আর মাটি পানির সাথে। ফিরে যাওয়া হয়নি আর ফেলে আসা নিজ আবাস ভূমিতে। অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, পাহাড়ী ঝর্না, ছড়া, গাঙ একে আরো করেছে মোহনীয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে কিছুটা কোলাহল মুক্ত হলেও এই জনপদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তঃস্থলে অনাবিল শান্তি বহমান ছিল। তাদের চাহিদা ছিল সীমিত, আকাঙ্খা ছিল সীমাবদ্ধ। এতে তারা যে আনন্দ লাভ করত তা ছিল অনাবিল, অকৃত্রিম। এক সময় দেখা গেল তাদের এই অনাবিল সুখ শান্তি দেখে অনেকের সহ্য হলো না। তাদের লোভাতুর চক্ষু তাদের দিকে পড়ল বক্রভাবে। ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হলো তা সমগ্র পার্বত্য জনপদে বিশেষ করে রেহাই পেল না আদিবাসীদের এতদিনের আওতাভূক্ত ভূমি এবং বনজ সম্পদ সমূহ। শাসন, শোষন, নির্যাতন চলল দীর্ঘ সময়ব্যাপী, অনেকে নিজের স্বার্থ হাসিল করে পাততারি গুটিয়ে চলে গেল। তারা গেল তারা হয়ত আর ফিরে এলো না। কিন্তু যা রেখে গেল সেগুলো পুঁজি করেই তৈরী হলো শাসন শোষনের কলাকৌশল। এতোদিনের গচ্ছিত সম্পদকে লুন্ঠনে উঠে পড়ে লেগে গেল, তাদের সহযোগীতা করলো শাসকের পক্ষ। রাজসিক কুদৃষ্টি নিবদ্ধ পার্বত্য নৈঃস্বর্গ দ্রুত শ্রীহীন হতে বাকি রইলনা। আজ যেন সে এক আটপৌড়ে রমনী। যার বুকে আজ জৌলুস নেই, নেই তার আর সেই সৌন্দর্যরূপমন্ডিত রূপ, আছে শুধু পুড়ে যাওয়া কঙ্কালসার একখানি নিথর দেহ। আগ্রাসন, শাসন, শোষন, নির্যাতন নিপীড়নে তার দেহঘড়ি আজ ক্ষতবিক্ষত। অসংখ্য কীট তাকে খাবলে খাবলে নিথর করে চলেছে। চলন, বলন, শক্তি রহিত হয়ে শয্যাশায়ী হতে চলেছে।

প্রাচীন কাল থেকে এখানকার বসবাসরত আদিবাসীদের জীবনযাত্রা জুম নির্ভর। এখনও জুম চাষের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে অনেকে। জুম চাষের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ আহরণ তাদের জীবিকার আরেক উৎস। এ অরন্যের সম্পদ তারা আহরন করে। নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে। এর বাইরে কখনও তার উপর অত্যাচার চালায়নি বরং আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাকে রক্ষা করতে, কিন্তু দ্রুত যেন সেই বাড়া ভাতে ছাই পড়ল। অল্প সময়ে সবকিছু যেন পাল্টে গেল। যেখানে তারা অনাদিকাল ধরে বসবাস করেছে, যে কুয়া, গাঙ, ঘাট ছড়া ব্যবহার করেছে, যে পথ দিয়ে রাতবেরাতে চলাফেরা করেছে, সেগুলো আজ তাদের নেই। রাতের কথা বাদ দিয়ে দিনের বেলায় সেদিকে পা বাড়াতে গায়ে কাঁটা দেয়, কোন অজানা ভয় যেন তাড়িয়ে বেড়ায়; ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুর দেখলে ভয় পায়, সে ভয় যেন আঁতে বাসা বেঁধেছে। যে ভয় হয়ত তাকে আমৃত্যু তাড়িয়ে বেড়াবে। তার অন্তরাত্মা ধ্বংস হয়ে দূর্বল চিত্তে পরিণত হবে। পাহাড় দেশে রাস্তা হলো, ব্রিজ, কালভার্ট হলো, আনাচে কানাচে পার্বত্য

দূর্গম এলাকায় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল, এলাকার সাধারণ খেটে খাওয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠী চমকিত হলো সদাশয় সরকারের বদান্যতা দেখে। কারণ তারা ভাবতে পারেনি তাদের এলাকায় এত দীর্ঘ সময় পর বিদ্যুৎ আসবে। অথচ স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারনে হাজার হাজার আদিবাসী পরিবার নিজেদের ফসলী জমি হতে বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশের ভেতরে এবং দেশের বাইরে পার্শ্ববর্তী দেশে দেশান্তরি হতে বাধ্য হয়েছে। নিজের বাসভূমি ছেড়ে ত্রিপুরা, মিজোরাম, কিংবা অরুনাচলে গেছেন তাদের অনেকে আজ ভবলীলা সাঙ্গ করে পরপারে চলে গেছেন, মাতৃভূমি শেষ দেখা হয় নি। তাদের আত্মা যদি নিজে মাতৃভূমিতে ঘুরে তারাও হয়ত এ বদান্যতা দেখে চমকিত না হয়ে পারবেন না। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন সরকারী বেসরকারীভাবে উন্নয়ন যজ্ঞ চলছে। সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছে ফি বছর যা আমরা তথা দেশে বিদেশে পত্র-পত্রিকা এবং মিডিয়ার বদৌলতে দেখে তারাও অভিভূত এবং চমৎকৃত। রাস্তাঘাট, হাটবাজার ব্রিজ, কালভার্ট হয়েছে, বিদ্যুৎ গেছে অথচ এককালে সে অঞ্চলগুলো জন বিরল ছিল, কোন রকমে আদিবাসী জনগোষ্ঠী দিন যাপন করতো সে জায়গা গুলোতে রাজসিক দৃষ্টি পড়েছে। হাজার হাজার সমতলের বাস্তুহারা পরিবার পুনর্বাসিত করা হয়েছে। আকর্ষিত হয়েছে ঢাকায় বসবাস করা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইমারতে থাকা ক্রোড়পতিরা। সরকারী প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগীতায় আদিবাসীদের হাজার একর পাহাড়ী জমি বেদখল করল, গড়ে উঠল বিনোদন কেন্দ্র, ফল বাগিচা, কিংবা বিশাল বিশাল রাবার প্রকল্প। এখনও এ দূরভিসন্ধি মূলক কার্যক্রম বন্ধ হয়নি।

তাদের সহযোগীতা করে চলেছে সচিবালয় হতে স্থানীয় প্রশাসন পর্যন্ত। এতে সহযোগীতা করে চলেছে এক শ্রেনীর অর্থ লোভী স্বার্থান্বেষী, অদূরদর্শীতা সম্পন্ন কিছু আদিবাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। অথচ তাঁরা একটুও ভাবেন না ভূমি হারালে তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। কিসের উপর ভিত্তি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ হবে। এর শেষ পরিণতি কি হবে? এ ভূমি দূস্যতা এভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকলে হয় এ পার্বত্য অঞ্চল একদিন বিরান ভূমিতে পরিণত হবে। এখানে ভূমিই যেন মূখ্য এখানে শত বছর ধরে আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূখ্য নয়। একদিকে ভূমি দূস্যতা অন্যদিকে অন্য জেলা হতে নিয়ে আসা হাজার হাজার পরিবারের অভিবাসন এ অঞ্চলকে দিন দিন বসবাস অযোগ্য করে তুলছে। শুনা যায় অনেক জায়গায় আদিবাসীদের সাথে যখন ঝামেলা হয়, তখন তারা সোজা বলে "দেশ আমার মাটি আমার' তার অর্থ সোজা কথা জোর যার মুল্লুক তার" যেন মধ্যযুগীয় যে কোন বর্বরতাকেও নীরব সমর্থন ছাড়িয়ে যায়। তাদের এই দম্ভোক্তির পেছনে প্রশাসনের বরাবরই আর্শীবাদ রয়েছে, যা কারো অজানা নয়। আদিবাসীদের হাজার হাজার একর ধান্য জমি বেদখলে যাওয়া সেগুলো উদ্ধারে প্রশাসন সব সময় নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছেন। অনেক সময় দেখা যায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ভূমি কমিশন গঠন, ইত্যাদি ব্যাপারে যতই কলা মলা দেখানো হোক সেটা আসলে যে লাউ সে কদু' দেশে যে সরকার আসুক না কেন, পার্বত্যঞ্চলের আদিবাসীদের ভাগ্যের চাকা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে, বরং আরো খারাপের দিকে ধাবিত হবে।

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রা উন্নয়নে এ অঞ্চলে দেশী-বিদেশী অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে চলেছে। তাদের উন্নয়ন কর্মসূচী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তৃণমূল পর্যায়ে কতটুকু উন্নয়নের সুফল পৌঁছেছে তা যে কেউ বলতে পারবেন। এক শ্রেনীর আমলা এতে লাভবান হয়ে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে, হাটে বাজারে তাদের সওদা করার ধরন দেখলে রাজসিকতাকেও হার মানাবে। তাদের নিম্ন স্তরের কর্মচারী যে বেতন পান সরকারী একজন প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তাও সে বেতন পান না। দেখা যায় সিংহভাগ এসমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারী অর্থের অন্ধত্বে বুদ হয়ে নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। যা আমাদের মতো সংখ্যালঘিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য কখনও কাম্য হতে পারেনা। উন্নয়নমূলক কাজে যে সমস্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তার নিয়মগুলো সাত পাঁকে বাঁধা। সেগুলো পালন করতে গিয়ে তাদের নাভিশ্বাস উঠে। অনেক সময় দেখা যায় অর্থ ভাগ বাটোয়ারা করতে গিয়ে মারামারি পর্যন্ত লেগে যায়। যার কারনে প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ট আত্নীয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। আর এ বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ কমিটির কতিপয় সদস্যের পকেটস্থ হয়। সাধারণ সদস্যেরা এতে ন্যায্য অংশীদারী পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। আদিবাসীরা জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মুক্ত পরিবেশে গড়ে উঠার কারনে এসমস্ত গৎবাঁধা, ধরাবাঁধা নিয়ম কানুন পালনে অভ্যস্ত নয়। তাদের এই মুক্ত জীবন চলার পদ্ধতি ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ কথা ভাবতে অবকাশ দেয় নি। ভাবেনি তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও আবাসন নিবাসন ক্ষেত্রে। ভূমি নিয়ে এতো যে জটিলতা কিংবা ছল ছাতুরী হবে তা হয়ত তারা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। সে সময় বনজ সম্পদের কোন অভাব ছিলনা, ছিল না তাতে সংগ্রহে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম, নিজেদের প্রয়োজনে তারা ব্যবহার করেছে পর্যাপ্তভাবে। তখন এ অঞ্চল হতে বানিজ্যিকভাবে বনজ সম্পদ ব্যাপকভাবে সংগ্রহ শুরু হয়নি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে দিন দিন বহিরাগত সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে এখানে পরিবেশগত এবং সামগ্রিক দিক নানা বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। পার্বত্যঞ্চলের আদিবৃক্ষ গর্জন করই তেলসুর, গুটগুট্যা প্রভৃতি স্থানীয় বনজ বৃক্ষ বিলুপ্তির পথে, সেই সাথে বিলুপ্ত হয়েছে অনেক বন্য পশু-পাখি। বনজ বৃক্ষ শেষ হওয়াতে এখন কাঠ ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি পড়েছে আম-কাঁঠাল কাঠের দিকে। যে হারে আম-কাঁঠাল গাছ প্রতিবছর পাচার হচ্ছে আগামী কয়েক বছর পর হয়ত এ অঞ্চলে এগুলোর ঘাটতি দেখা দিবে। বিগত কয়েক দশক আগে সরকারীভাবে কাচালং সুবলং, মেয়নী, রাইখ্যং, মাতামুহুরী নদীর উপত্যকায় সেগুন কাঠের বাগান সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু সরকারী কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারী ছত্রছায়ায় এসব বনাঞ্চল আজ বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

সমতলবাসী একজন কৃষক যে রকম রাষ্ট্রীয় তথা আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা পান একজন আদিবাসী জুমিয়া কৃষক সেই সুযোগ সুবিধা পান না। সমতলবাসী কৃষকরা সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ পেয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সাফল্য পান, অন্যদিকে বিভিন্ন কারনে একজন আদিবাসী কৃষক এ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজস্ব ভূমি, কারিগরি প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞতা থাকলে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে বিনিয়োগ কারীদের নেতিবাচক চিন্তাধারার কারনে তা কখনও আলোর মুখ দেখে না। তাই একই দেশের নাগরিক হিসেবে

বৈষম্য, নেতিবাচক দিক পরিহার করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে আদিবাসী অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা উচিত। অনেক সময় দেখা যায় কিছু অর্থনৈতিক অবকাঠামো দাঁড়করালেও সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ক্ষতিসাধন করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে কালক্ষেপন করে। পরবর্তীতে ভিকটিম এলাকায় এসে সান্ত্বনা দিয়ে চাল ডাল এবং কিছু অর্থ বরাদ্দ দিয়ে প্রশাসন দায়িত্বতার পবিচয় দেন। এ প্রহসনমূলক কার্যকলাপে আদিবাসীদের মনে আরো নেতিবাচক চিন্তাধারার জন্ম দেয়, সম্প্রীতিভাব চির ধরে। একে অপরের বিশ্বাসে আঘাত হানে।

তাই পরিশেষে বলবো, এদেশ সম্প্রীতির দেশ, নানা, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি পূর্ণ দেশ। আবাহমান কাল থেকে বৃহৎজন পরিণত হয়েছে। আসলে সুকৌশলে এ অঞ্চলকে প্রাকৃতিক সম্পদহীন করে আদিবাসী অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল করা ছিল মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে রাবার এবং আগর চারা রোপনের হিড়িক পড়েছে। এক শ্রেনীর আমলা, ভূমি দূস্যরা এসব কাজে স্থানীয়দের বিভিন্নভাবে প্রলোভিত করছে। দেশীয়ভাবে রাবার উৎপাদন ও বিপননের ব্যবস্থা থাকলেও অন্যদিকে আগর চাষ অনেকটা এক শ্রেনী লোকের কাছে জিম্মি। প্রথমদিকে কিছু আর্থিক সুবিধা দিলেও পরবর্তীতে সে রকম সুবিধা থাকার সম্ভাবনা নেই। তার কারণ এটি থেকে পারফিউম তৈরী করতে যত টাকার যন্ত্রপাতি এবং কলা কৌশল প্রয়োজন এ ব্যাপারে আদিবাসীদের ধারণা নেই। তাই এ সমস্ত আগর চাষীরা সঠিক মুনাফা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। অসাধু ব্যবসায়ীর কাছে স্বল্প দামে বিক্রি করতে বাধ্য, তাছাড়া অন্যথায় জ্বালানী কাঠ, অথবা আসবাবপত্র তৈরী কাজে ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকেনা। এদিক থেকে নিজের সৃষ্ঠ বনজ বৃক্ষের নায্য মূল্য থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রত্যেক এবং পরোক্ষভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

আমার এ দ্রুত পরিসরের লেখার মাধ্যমে পার্বত্যঞ্চলের ভাগ্য বিড়ম্বিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী কয়েক খন্ড চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। কারণ এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর সাথে অন্যঅঞ্চলের অর্থনৈতিক অবকাঠামো মিল নেই। কারণ এ অঞ্চলের আদিবাসীদের জুম চাষ নির্ভর অর্থনৈতিক কাযক্রমের সাথে সমতল বাসী কৃষকদের মিল নেই। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সংখ্যালঘিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও বৈচিত্র্য সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ দেশ নিঃস্ব নয়। ইতোমধ্যে দেশে বিদেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে। সাংস্কৃতিক, ভাষা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু মিল অমিল থাকা স্বাভাবিক সবকিছুর উর্দ্ধে যা হলো, সবার নেতিবাচক দিক পরিহার করে ইতিবাচক গঠনমূলক চিন্তা শক্তি জাগ্রত করা। আশার কথা যে এদেশে দিন দিন প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধি চিন্তা সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের সংখ্যা যতই বাড়বে ততই হবে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার মঙ্গল, সেই সোনালী দিনের প্রত্যাশায় আমরা সবই আশাবাদী।

.....

* আনন্দমিত্র চাকমা, সহ-শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়।

শুভ্র জ্যোতি চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিদের ভাষা প্রসার ও বিকাশে অন্তরায় ও উত্তরণে করণীয়

প্রাক-কথন

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ভৌগলিকভাবে দেশের অপরাপর এলাকা থেকে যেমনি ভিন্ন তেমনি সেখানে নানা জাতির বসবাস ও তাদের ঐতিহ্যমন্ডিত বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি এলাকাটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ফলে পার্বত্য এলাকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী এবং সেখানকার পাহাড়ি জাতিগুলোর জীবনযাত্রা এবং তাদের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি অবলোকন করলে আগন্তুক সকলকে মোহিত হতেই হয়। শুধু পার্বত্য অঞ্চল কেন সারা বাংলাদেশ নানা সংস্কৃতির অবয়বে পরিপূর্ণ একটি দৃষ্টিনন্দন সংস্কৃতির দেশ। বহু ভাষা ও জাতিসত্তার দেশ। মোট কথা আমাদের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও এর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল অত্যন্ত মজবুত ও পরিপূর্ণ। এ অফুরন্ত সৌন্দর্যের মাঝে লুকিয়ে আছে অপার সম্ভাবনা যা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অমূল্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হলে পর্যটন খাতে বিশাল অর্থ আয় করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাঙালি জাতি ব্যতিত বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জাতিদের নানা অভিধায় পরিচয় করানো হয়ে থাকে। যেমন-উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, সম্প্রদায়, পাহাড়ি (বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারীদের) ইত্যাদি পরিচিতিমূলক নানা শব্দ। কোনো দেশে এতগুলো অভিধা বোধয় অন্য কোনো জাতির বেলায় ব্যবহৃত হয় না। লেখক ভেদে, সরকারি নথিপত্রে এবং নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে এ সকল জাতিরা যে অভিধা ব্যবহার করে তাতে শব্দগত বৈপরীত্য থাকলেও একই অর্থে তা ব্যবহৃত হয়-এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এসব অভিধা ব্যবহারে দীর্ঘদিন ধরে বিশেষত সরকার ও এ সকল জাতিদের মধ্যে টানাপোড়ন চলছে। বিশেষত আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার নিয়ে রীতিমত চলছে রাজনীতি। অপরদিকে সরকারিভাবে যে শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে তাতেও অখুশি ঐ সকল জাতিগোষ্ঠীরা। সব মিলিয়ে গোঁজামিল অবস্থা বিরাজমান। এ বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিক হিসেবে তাদেরকে কী পরিচয়ে পরিচিত করতে চায় তা একটু দেখা যাক। সংবিধানের নাগরিকত্ব শিরোনামের ৬(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-***'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া গণ্য হইবেন।'*** এটি দ্বারা বোঝা গেল যে দেশে বসবাসকারী সকল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে

সকলে বাঙালি। আদৌ কি এটি সত্য ? কোনোদিন সত্য হওয়া সম্ভব নয়। আবার ২৩(ক) অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে-***'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'*** অনুচ্ছেদ ২৩(ক) দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, দেশে কিছু উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় আছে তবে জাতিতে তারা বাঙালি(?)। অর্থাৎ এ সকল জাতিগোষ্ঠীদের বৈশিষ্ট্য আলাদা হলেও তারা সংবিধানের ভাষায় জাতিগতভাবে বাঙালি হবেন। প্রাসঙ্গিকক্রমে দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের মধ্যে কারা উপজাতি, কারা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, কারা নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়-এ প্রশ্নটিও এসে যায়। সংবিধানে যে সকল জাতিসত্তার পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যাখ্যা থাকা উচিৎ।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে বাঙালি জাতি ছাড়া যে সকল জাতির বসবাস রয়েছে তাদের পরিচয় বাচক শব্দ নিয়ে খোদ সংবিধানেই অস্পষ্টতা বিদ্যমান। এতগুলো বিশ্লেণাত্বক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের কেউ কেউ বুঝি উপজাতি, কেউবা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, কেউ নৃ-গোষ্ঠী আবার কেউবা সম্প্রদায়। অন্তত সংবিধানে উল্লিখিত ভাষ্য অনুসারে তা মনে হতেই পারে। যে সংবিধানের আলোকে দেশ পরিচালিত হয় সেখানে যদি পরিচয় বাচক শব্দ নিয়ে এলোমেলো অবস্থা বিরাজমান থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সে পরিচয়বাহী জাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতিগত উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ সকল বিবেচনায় আলোচ্য প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীদের পাহাড়ি জাতি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বিতর্কে না গিয়ে এলাকার বৈশিষ্ট্য ও হাজার বছরের পার্বত্য সংস্কৃতির আদলে গড়ে ওঠা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জাতিদের পাহাড়ি বলাই শ্রেয় বলে মনে করি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি ছাড়াও ১০ ভাষাভাষি ১১টি পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বাস করে। এ সকল জনগোষ্ঠীগুলো হচ্ছে-চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং, খুমী ও লুসাই। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা একই ভাষাভাষি হওয়াই ১১টি জাতি হলেও ১০ ভাষাভাষি বলা হয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এসে তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের ভাষাকে চাকমা ভাষা থেকে ভিন্ন মনে করেন এবং প্রায় চার বৎসর পূর্ব থেকে চাকমা বর্ণমালার আদলে স্বতন্ত্র বর্ণমালাও প্রবর্তন করেন যা আলাদাভাবে কম্পিউটারে ফন্ট তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী পাহাড়িদের জনসংখ্যা আনুমানিক ৯ লক্ষ। আমাদেরকে অনুমান নির্ভর হতে হয় এই জন্য যে, তাদের জনসংখ্যা নিয়ে আলাদা কোনো তথ্য নেই। তবে একটি সূত্র মতে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা ৪,৪৪,৭৪৮ জন, মারমা ২,০২,৯৭৪ জন, ত্রিপুরা ১,৩৩,৭৯৮ জন, তঞ্চঙ্গ্যা ৪৪,২৫৪ জন, ম্রো ৩৯,০০৪ জন, বম ১২,৪২৪ জন, খিয়াং ৩,৮৯৯ জন, খুমি

৩,৩৬৯ জন, চাক ২,৮৩৫ জন, পাংখোয়া ২,২৭৪ জন, এবং লুসাই ৯৫৯ জন। ভাষা গবেষকরা মনে করেন, যে জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা এক লক্ষের নিচে সে জাতির ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সম্ভাবনা যদি সঠিক মনে করা হয় তাহলে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষা ব্যতিত অন্য ৮টি ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যদিও সৌরভ সিকদার মনে করেন-চাকমা ভাষা যে ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন বর্তমানে এ ভাষা বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং অদৃশ্য আগ্রাসনের মাধ্যমে হুমকির সম্মুখীন (বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা ঃপৃষ্ঠা-৫৬)। বিলুপ্ত হয়তো এখন হবে না, কোনো এক সময়ে হয়তো এটি ঘটে থাকবে। যা হবে অত্যন্ত দু:খজনক। গবেষকদের ভাষা বিলুপ্তির তত্ত্ব সত্যিই আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে এই কারণে যে, বিলুপ্তি সাথে সাথে সভ্যতা থেকে অনেক মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে যাবে। বৈচিত্রতা হ্রাস পাবে। তবে আমরা আপাতত হতাশ হই না কারণ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে তথা ভারত এবং মিয়ানমারে এ সকল জাতিসমূহের একটি বড় অংশ বসবাস করে থাকে। ঐ সকল দেশের সাথে তাদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ থাকে-সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এটিই আমাদের ভরসা। SIL(Summer Institute of Linguistic) প্রকাশিত Ethnologue language of the world শিরোনামের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট ৪০টি ভাষা রয়েছে যেগুলোর সবকটি জীবন্ত। অদ্যাবধি আমাদের দেশ থেকে কোনো একটি ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে সে ধরনের দু:সংবাদ আমাদের নেই। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে-Of these 5 are institutional, 11 are developing, 16 are vigorous, and 8 are in trouble. ভারত থেকে প্রকাশিত Times of India আগস্ট ৯, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রকাশিত একটি দু:খজনক সংবাদের শিরোনাম হল-**India lost 220 languages in last 50 years, survey finds.** Vadodara নামের একটি ভাষা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে-ভারত গত ৫ দশকে মোট ভাষার ২০% ভাগ ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের দেশে পাহাড়ি জাতিদের ভাষাগুলো এখনো জীবিত থাকায় এদিক বিচারে আমরা অনেকটা ভাগ্যবান।

প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী ১১টি পাহাড়ি জাতির ভাষা নিয়ে প্রাথমিক(তাত্ত্বিক নয়) আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আইন অনুসারে তাদের ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ সর্বোপরি সামাজিকভাবে নিজস্ব ভাষার ব্যবহারের কিছু খন্ডিত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তব প্রেক্ষাপটের আলোকে আলোকে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে বিধায় ব্যবহৃত সূত্রের উল্লেখ করা সম্ভব হয় নি। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, বিগত সময়ে পাহাড়িদের ভাষা নিয়ে কিছু তাত্ত্বিক গবেষণা হয়ে সেগুলো পুস্ত কাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-প্রখ্যাত ভাষা গবেষক ড. জি.এ.গ্রিয়ার্সন-এর Linguistic Survey of India, SIL(Summer Institute of

Linguistic)-এর ৩টি বই যথা-বাংলাদেশের কুকি-চীন সম্প্রদায় একটি সামাজিক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা(সেপ্টেম্বর ২০০৮), The Marma and Rakhine Communities of Bangladesh a socioliguistic survey(June 2007), The Chakma and Tangchagya Cummunities of Bangladesh a siciolinguistic survey(June 2007) এবং সৌরভ সিকদারের 'বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা'(মার্চ ২০১১ খ্রি:)। কিন্তু এ সকল গ্রন্থের সাথে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের তেমন সাদৃশ্য না থাকায় উদ্ধৃতি প্রদান করা সম্ভব হয় নি। তাই আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনায় চলমান প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। প্রবন্ধটির সীমাবদ্ধতা এখানে।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অনেক বছর পূর্ব থেকেই ভাষা নীতি প্রচলন করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালে প্রণিত সংবিধানের আলোকে ১৯৬৫ সালে হিন্দিকে দাপ্তরিকভাষা (official language) করা হলে হিন্দিভাষী নন এমন জাতিদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধন করে হিন্দি এবং ইংরেজিকে দাপ্তরিকভাষা করা হয় এবং হিন্দিভাষী নন এমন জাতিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এমনকি সেখানে ভাষা নীতি অনেক আগেই চালু করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ বহু ভাষা-ভাষির দেশ হলেও স্বাধীনতার ৪২ বছর পরেও ভাষা নীতি প্রণয়ন করা হয় নি। রাষ্ট্রভাষা ও দাপ্তরিক ভাষা উভয়ই বাংলা হওয়ায় দেশের সর্বক্ষেত্রে সকল জাতিকে বাংলা ভাষার চর্চা করতে হয়। বাংলা ভাষী নন এমন জাতিদেরও বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা চর্চা করতে হয়। এ অবস্থায় দেশের অন্যান্য ভাষাগুলো নিভু নিভুভাবে বেঁচে থাকবে সেটিই তো বাস্তবতা হবে।

ভাষা নীতি না থাকলেও সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এবং ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিমালার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিদের ভাষা বিষয়ে যে সকল দায়িত্বাবলী ও কার্যাদি সম্পাদিত হচ্ছে বা হওয়ার কথা সেগুলোকে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা ও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভাষা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

ক) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটসমূহ

বাংলাদেশ বহুমাত্রিক সংস্কৃতি ও ভাষার দেশ হলেও স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও সরকারি হিসেবে দেশে কতটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং ভাষা রয়েছে তার সঠিক সংখ্যা আমরা জানি না। সংখ্যা নিরূপনে এখনো সঠিক গবেষণা হয় নি। তবে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত 'সংহতি' নামক সংকলনে দেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৪৫টি নাম প্রকাশিত হয়েছিল। সৌরভ সিকদার লিখেছেন-বাংলাদেশে ৪০টির অধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসী রয়েছে। (বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা ঃ পৃষ্ঠা-১) বইটির শেষ দিকে লিখেছেন-ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে এদেশ সমৃদ্ধ। ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ৩০টির নিজস্ব

ভাষা রয়েছে (পৃষ্ঠা-২০৮)। এটি যদি সত্য হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, অবশিষ্ট ৫টি জাতি অন্য জাতির ভাষা চর্চা করে থাকে। তাদের ভাষাকে হারিয়ে অন্যের ভাষা গ্রহণ করেছে। একই বইয়ে দুই ধরনের তথ্য পাঠককে সত্যিই বিভ্রান্ত করছে। এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এখনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা নিরূপন করতে পারে নি। সঠিক সংখ্যা নিরূপনে সারা দেশ থেকে জেলা প্রশাসক ও ৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান থেকে তালিকা চাওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্যাদি এখন যাচাই-বাচাই করা হচ্ছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়টি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই বিষয়টি সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত আমরা বলতে পারি না যে, দেশে কতটি ভাষা রয়েছে। এ যদি প্রেক্ষাপট হয়ে থাকে তাহলে কীভাবে এ সকল জনগোষ্ঠীগুলোর ভাষার উন্নয়ন কামনা করতে পারি !

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নেত্রকোনা জেলার বিরিশিরিতে প্রথম উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি) এর পরে ১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে বেশি পরিমাণে প্রাধান্য পেয়ে থাকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য তেমন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা যায় নি, অদ্যাবধি করা যাচ্ছে এ কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। বর্তমানে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি (শিল্পকলা একাডেমির প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৩ সালে), বান্দরবান (১৯৮৮ সালে), কক্সবাজার (১৯৯৪ সালে), মৌলভিবাজারের কমলগঞ্জ (শিল্পকলা একাডেমির প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৩ সালে), রাজশাহী (শিল্পকলা একাডেমির প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৩ সালে) এবং নেত্রকোনা জেলার বিরিশিরিতে মোট ৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলি এখনো মোটা দাগে বিশেষত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য তেমন কাজ করতে পারে নি। ইনস্টিটিউটগুলো ছোট পরিসরে শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষা কোর্স বাস্তবায়ন করে চলেছে-যা একটি জাতির ভাষার সামগ্রিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও প্রসারে যথেষ্ট নয়। রাঙ্গামাটিস্থ ইনস্টিটিউটের অধীনে শুধুমাত্র চাকমা ও ত্রিপুরা ভাষার শব্দকোষ নিয়ে ২টি বই, চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষার ৩টি ছোট আকারের বই এবং চাকমা বর্ণমালায় ২টি বই প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যান্য ইনস্টিটিউটগুলো থেকে এ ধরনের বই এখনো প্রকাশিত হয় নি। এছাড়া ৬০টির অধিক চাকমা ও ত্রিপুরা ভাষা কোর্স পরিচালিত হয়েছে। অন্যদিকে বান্দরবান ইনস্টিটিউটের অধীনে মারমা, বম ও ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স এবং খাগড়াছড়ি ইনস্টিটিউটের অধীনে চাকমা ভাষা শিক্ষা কোর্স ছোট পরিসরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, সরকার নিয়ন্ত্রিত ইনস্টিটিউটগুলোর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার চর্চা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণে যে কার্যক্রম বিদ্যমান তা ভাষা সংরক্ষণ ও প্রসারে যথেষ্ট নয়। তবে এটি সত্য যে, শুধুমাত্র ভাষা নিয়ে কার্যক্রম

বাস্তবায়ন করার জন্য ইনস্টিটিউটগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এখন দেখা যাক ইনস্টিটিউটগুলোর কার্যতালিকায় ভাষা নিয়ে কী করণীয় রয়েছে।

রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর কার্যতালিকায় শুধুমাত্র ২টি জায়গায় ভাষা বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে সাদামাথাভাবে উল্লেখ রয়েছে যা বর্তমান যুগে অনেকটা অচল বলা যায়। যেমন-2(a) Collecting information and data regarding the tribal ways of life, their ***language***, customs, beliefs, rites, rituals etc. and carrying out research on those subjects. 2(b) Organising tribal ***language courses*** for the officers and staff of the government and autonomous bodies posted in the tribal areas. বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর কার্যাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে-Carrying out of research programmes and collection and preservation of the elements of history, social and cultural traditions, ***language,*** literature, music, dance, arts and crafts, religion, customs, rites, tradition and practices of small ethnic communities. Implementation of programmes on development and training on the ***language,*** literature, music, dance, drama, acting and fine arts. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে- To collect the local history and heritage, ***language*** and folk-culture, the particulars of folk art and culture and conduct researches. দেখা যাচ্ছে যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলীতে ভাষা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড পরিচালনা করার তেমন সুযোগ রাখা হয় নি। অনেকটা সাদামাথাভাবে ভাষা বিষয়ক কর্মকান্ডকে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। এর ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য কাজ তেমন বাস্তবায়িত হয় নি। এ অবস্থা বিরাজমান থাকলে বা ভাষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার্থে বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ভবিষ্যতেও এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভাষার অগ্রগতি সাধিত হবে এমনতর আশা ক্ষীণ।

খ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে ভাষা বিষয়ক কার্যাবলী

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের সংস্কৃতি বিকাশে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনগত ভিত্তি ২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ছিল না। ঐ বছরের ১২ এপ্রিল **'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০'** (২০১০-এর ২৩ নং আইন) পাশ হওয়ার পর থেকে তিন পার্বত্য জেলায় ৩টি এবং সমতল এলাকায় ৪টি সহ মোট ৭টি প্রতিষ্ঠান এ আইনের আওতায় আসে। দীর্ঘদিন ধরে শুধুমাত্র নির্বাহী আদেশ বলে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সীমিত স্বার্থের মধ্যে কাজ করছিল। আইনে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১৫টি কার্যাবলী নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এ আইনের ৯(ক) ধারায় বলা হয়েছে-সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ***ভাষা,*** সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা,

সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচী পরিচালনা করা। ৯(ছ) ধারায় বলা হয়েছে-***ভাষা,*** সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চারুকলার উপর প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। ভাষা বিষয়ে আলাদাভাবে বিশেষ কোনো কাজের কথা উল্লেখ এখানেও নেই।

গ) জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬

২০০৬ সালের ২৯ নভেম্বর তারিখে দেশে **'জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬'** প্রকাশ করা হয়। এ নীতির ৫.২ ক্রমিকে বাংলা একাডেমির জন্য যে কর্মসূচি বা কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে তম্মধ্যে একটি হচ্ছে-(ঝ) যে সকল ***উপজাতীয় ভাষা*** তেমন প্রচলিত নয় সে সব ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রকাশ ও একুশে বই মেলায় প্রদর্শন। এ নীতি প্রবর্তনের পর বাংলা একাডেমি পাহাড়ি ভাষা সংশ্লিষ্ট কোনো বই প্রকাশ করেছে বলে মনে হয় না। ৫.২ ক্রমিকের 'উপজাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ' শীর্ষক শিরোনামের 'ক'-তে বলা হয়েছে-পার্বত্য ৩টি জেলার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহের ***স্ব স্ব ভাষা*** ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চর্চা, অনুশীলন এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষাসহ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করা। এছাড়া 'ঙ' নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয়েছে-উল্লিখিত সকল উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে আবশ্যিকভাবে *বাংলা ভাষা* ও সাহিত্য শিক্ষাসহ জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সকল অঙ্গনের সাথে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করা। উল্লিখিত ২টি কার্যক্রমের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীদের নিজস্বতা বিশেষত ভাষা হারানোর পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার ইঙ্গিত বহন করে। নিজ মাতৃভাষার বাইরে কোনো ভাষা শেখা সেটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। জাতীয় সংস্কৃতি নীতিতে পাহাড়িদেরকে বাংলা ভাষা বাংলা ও সাহিত্য আবশ্যিকভাবে শেখানোর কথা উদ্ধৃত করার অর্থই হচ্ছে তাদের উপর বিষয়টি চাপিয়ে দেয়া। এবং এ দ্বারা পাহাড়িদের ভাষা ও সাহিত্যকে অবমূল্যায়ন করার সামিল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এছাড়া এটিও বোঝায় যে, পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীদের এখনো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার আলোর বাইরে থাকা মানব মনে করা হচ্ছে। উল্লিখিত বিষয়ের মাধ্যমে পাহাড়িদেরকে অনেকটা হেয়ালিপনাই পরিলক্ষিত হয়। বরং উল্লেখ করা উচিৎ ছিল যে, পাহাড়ি জাতিরা যাতে তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি মূল স্রোতোধারার অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির সাথে তুলে ধরতে বা পরিচিত করতে পারে সে লক্ষে সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

ঘ) সর্বস্তরে বাংলা-উপেক্ষিত পাহাড়ি ভাষা ও বর্ণমালা

বাংলাদেশ বহুমাত্রিক সংস্কৃতি ও ভাষাভাষির দেশ হলেও দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হচ্ছে বাংলা। দেশের প্রায় ৯৯% মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষা বাংলার জন্য রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও প্রাণোৎসর্গ করার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার যৌক্তিকতা মিলে। কিন্তু এ

আবেগের মধ্য দিয়ে দেশের অপরাপর জাতিগোষ্ঠী যাদের সংখ্যা কম হলেও তাদের মাতৃভাষাকে অবহেলা অন্ততপক্ষে বাংলাদেশে হওয়া অনুচিৎ। কারণ যে দেশে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছিল সে দেশে অন্যদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করা বা অবজ্ঞা করা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত নয়। বরং মাতৃভাষার জন্য নেতৃত্বদানকারী দেশের সংখ্যাগরিষ্ট জাতি বাঙালিদের স্বীয় দায়িত্ব হওয়া উচিৎ দেশে বসবাসরত পাহাড়ি জাতিদের মাতৃভাষাকে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ঘটানো। এ চেতনাবোধ ও দায়িত্ববোধ থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল সেখানেও পাহাড়ি ভাষা ও বর্ণমালাগুলো অবহেলিত। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভবনের সামনের দেয়ালে যে সকল বর্ণমালা চিত্রিত করা হয়েছে সেখানে স্বদেশি চাকমা বর্ণমালা স্থান পায় নি। অথচ স্বদেশি বর্ণমালা হিসেবে বাংলা বর্ণমালার পরেই চাকমা বর্ণমালার স্থান। সংখ্যাধিক্য বিচার করলে চাকমা ভাষার অবস্থানও দ্বিতীয়। এ যদি বাস্তবতা হয়ে থাকে তাহলে আমরা পাহাড়ি জাতিদের ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে অবশ্যই শংকিত।

এছাড়া ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ তারিখে প্রকাশিত 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭' (১৯৮৭ সালের ২ নং আইন)-এর মাধ্যমে সরকারিভাবে অপরাপর ভাষাগুলোকে অস্বীকার করার সামিল বলে গণ্য করা যায়। এ আইনের ৩ (২) ধারায় বলা হয়েছে '-------কোন কর্মস্থলে যদি কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আবেদন বা আপীল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে'। ৩(৩) ধারায় বলা হয়েছে 'যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধির অধীনে অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে'। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, দেশের সংখ্যালঘিষ্ট জাতিদের ভাষা প্রয়োগ ও ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। শিক্ষা গ্রহণ ও অফিস আদালতে পাহাড়ি ভাষাগুলো অবহেলিত। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা না জানা পাহাড়িদের সাক্ষ্য গ্রহণ, জবানবন্দী প্রদান ইত্যাদিতে সমস্যা হচ্ছে। পাহাড়ি জাতিদের মাতৃভাষার চর্চার ক্ষেত্র একমাত্র তাদের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। আধুনিক যুগে শুধুমাত্র পরিবারের গন্ডি ও সমাজের মধ্যে প্রচলন থাকা ভাষাগুলোর মৌলিকত্ব আশা করা যায় না।

ঙ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

পৃথিবীর সকল ভাষা নিয়ে গবেষণা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন ২০১০' জাতীয় সংসদে পাশ পূর্বক ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর তারিখে প্রকাশ করা হয়েছিল। এ আইনে ইনস্টিটিউটের জন্য ২৩টি ক্ষমতা ও দায়িত্ব উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে ৫টি দায়িত্বের মধ্যে স্পষ্টভাবে বাংলা ভাষার কথা উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্য কোনো ভাষার নাম এতে উল্লেখ নেই। (দেখুন-

ক্রমিক ১, ৩, ৪, ৫, ১১) ক্রমিক ২ ও ১০-এ শুধুমাত্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সেটি উল্লেখ করা হয় নি। দেখা যাচ্ছে এতেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিদের ভাষাকে অবহেলা করা হয়েছে। আইনে যে কোনো বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলে কাজ সম্পাদনে সুবিধা হয়ে থাকে। কেউ যদি ১১ ক্রমিকে উল্লেখিত (বাংলাসহ পৃথিবীর সকল ভাষার বিবর্তন বিষয়ক গবেষণা) দায়িত্বকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, ইনস্টিটিউট তো সকল ভাষার জন্য কাজ করবে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে তো বাংলা ভাষাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাতে কেন স্পষ্টভাবে বাংলা ভাষার নাম উল্লেখ করার দরকার কি? এ দ্বারা বোঝা যায়, কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্য ভাষার ক্ষেত্রে জোর কম দেয়া হচ্ছে বা হবে। এ প্রবন্ধের 'চ' ক্রমিকে উল্লেখিত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরো কিছু যোগ করতে চাই। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের দেয়ালে যে সকল বর্ণমালা চিত্রিত করা হয়েছে সে সব বর্ণমালা এবং তৎশ্লিষ্ট জাতিদের ভাষার অস্তিত্ব আমাদের দেশে নেই। দেয়ালের গাত্রে সেগুলো স্থান লাভ করতে পারলে স্বদেশে অস্তিত্ব নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা বর্ণমালাগুলো কী অপরাধ করলো যে সেগুলোকে বাদ দেয়া হলো ? এখানেও বুঝি সংখ্যাগরিষ্টের জোর ? যৌক্তিকতার বিচারে স্বদেশি বর্ণমালাগুলোকে দেয়ালের গাত্রে স্থান দেয়া উচিৎ ছিল বলে আমি মনে করি। এতে সংরক্ষণ ও প্রসারের কাজ হয়ে যেতে পারত। অস্তিত্ব যায় যায় অবস্থায় থাকা ভাষা ও বর্ণমালা নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্ত-বায়ন করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। আরো একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক যে, এ ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশে বসবাসকারী অর্ধ শতাধিক পাহাড়ি জাতিদের জন্য শুধুমাত্র ১টি গবেষণা কর্মকর্তার পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এ পদটি বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হবে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ ইনস্টিটিউটের অধীনে বছর খানেক পূর্বে মৌলভীবাজারে সমতল এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘূদের ভাষার উপর একটি মাত্র সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এতক্ষণ ধরে সরকারিভাবে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতিদের ভাষা বিষয়ক কার্যাবলী সম্পর্কে কিছু ধারণা প্রদান করা হলো। এবার আলোচ্য জাতিদের স্ব স্ব উদ্যোগে ভাষা চর্চা ও প্রসারে কি কার্যক্রম বা পদক্ষেপ বিদ্যমান রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করছি।

পাহাড়ি জাতিদের স্ব স্ব ভাষা সংরক্ষণ ও প্রসারে বিদ্যমান কার্যক্রম

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিদের সংখ্যা ১৫,৮৬,১৪১ জন। দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.১%। তম্মধ্যে পুরুষ ৭,৯৭,৪৭৭ জন এবং মহিলা ৭,৮৮,৬৬৪ জন। (সূত্র-বিবিএস-১৫ মার্চ ২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত) দেশের সংখ্যাগরিষ্ট বাঙালিভাষিদের তুলনায় একেবারে নগণ্য।

এ নগণ্য সংখ্যক জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো জাতি যাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একটির চেয়ে অন্যটি আলাদা। দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করায় তাদের জন্য সমন্বিত উন্নয়নও অনেকটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ফলে স্বাধীনতার ৪২ বছর পরেও তাদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য হারে ঘটে নি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী পাহাড়ি জাতিদের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। ভৌগলিকগতভাবে মোটামুটিভাবে পাশাপাশি বসবাস করায় তাদের জন্য যে কোনো বিষয়ে উন্নয়ন সহজে করার সুযোগ রয়েছে এবং বিগত সময়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ আমাদের পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু একটি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষায় সেগুলো যথেষ্ট নয়। বিশেষত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ও আকাশ সংস্কৃতির যুগে একেবারে সংখ্যায় কম সে সকল জাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষা করা কঠিন। দেশের বাস্তবতায় ও আইনে যেখানে তাদেরকে সকল স্তরে মাতৃভাষা প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই সেখানে কীভাবে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব! এ কঠিন বাস্তবতার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষায় সচেষ্ট রয়েছে। বিশেষত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টিকে তারা প্রাধান্য দিতে চায়। শিক্ষা কার্যক্রমে যদি স্ব স্ব মাতৃভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে শিক্ষা গ্রহণের সাথে মাতৃভাষার ব্যবহার ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাবে। তখন ভাষার ব্যবহার, চর্চা বৃদ্ধি পাবে। ভাষার বিলুপ্তির কথা তখন মূখ্য হয়ে উঠবে না।

ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ এর Support to basic education in Chittagong hill tracts শীর্ষক প্রকল্পে MLE (Multi Lingual Education) কম্পোন্যান্ট থাকায় ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাহাড়ি ৮টি জাতির মধ্যে ভাষা কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং ভাষা স্ব স্ব ভাষা সুরক্ষা ও প্রসারের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা উপকরণ তৈরির প্রক্রিয়ায় ভাষা কমিটির সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে শিক্ষা উপকরণে পাহাড়ি জাতিদের ঐতিহ্য কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু ইউএনডিপির ঐ প্রকল্প থেকে MLE কম্পোন্যান্ট বাদ দেয়ায় ভাষা কমিটিগুলো অনেকটা নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। তবে ভাষা কমিটিগুলো শিক্ষা প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার তারে তাদের সাথে SIL(Summer Institute of Linguistic) -এর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলতঃ SIL পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতির কিছু ভাষায় ডিকশনারি বা শব্দকোষ তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে তৈরিকৃত ডিকশনারি বা শব্দকোষসমূহ আপাত গ্রন্থাকারে ছাপার কোনো পরিকল্পনা SIL-এর নেই বলে জানা গেছে। খিয়াং ভাষার ডিকশনারি বা শব্দকোষের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ভাষাকে রক্ষা ও একটি গ্রহণযোগ্য বানান রীতি প্রচলনে ডিকশনারি বা শব্দকোষের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি পাহাড়ি জাতির মধ্যে প্রধান হচ্ছে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা। তুলনামূলকভাবে অন্যান্যদের চেয়ে এ জাতির লোকেরা সবদিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। জনসংখ্যাও বেশি হওয়ায় সরকারি ও এনজিও পর্যায়ে যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের প্রাধান্যতা লক্ষনীয়। ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাদের অংশগ্রহণ বেশি। সাহিত্য কর্ম বিকাশেও তাই। অপরদিকে ম্রো, খুমী, লুসাই, বম, পাংখোয়া, চাক ও খিয়াং ভাষায় সাহিত্য চর্চা একেবারে হাতে গোনা। খুমী ভাষার আধুনিক সাহিত্য নেই বললেই চলে। এ সকল জাতির মধ্যে সাহিত্য কর্ম সৃষ্টির জন্য লেখকের সংখ্যা একেবারে হাতে গোনা। বিশেষত বম, পাংখোয়া ও লুসাইরা মিজোরামের মিজো ভাষার সাহিত্যানুশীলন করে থাকে। সবদিক বিচারে ভাষার গতিশীলতা আনয়নে যে ধরনের উদ্যোগ স্ব স্ব জাতির মধ্যে গ্রহণ করা প্রয়োজন বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। বর্তমান যুগে শুধুমাত্র নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার প্রচলন থাকলে তা একটি জাতির ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। এ দিক বিবেচনায় স্ব স্ব জাতির ভাষাকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা না গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ ভাষাকে দীর্ঘমেয়াদে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না।

একটি জাতির ভাষা বিকাশ ও উন্নয়নে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মূলত সাহিত্যিকেরা ভাষার রূপ ও আঙ্গিক গঠন ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিদের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি না হওয়া এবং স্বল্প সংখ্যক যে সকল সাহিত্য কর্ম সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর স্বল্প প্রসারের কারণে ভাষার গতিশীলতা আনয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাহাড়িদের মধ্যে যারা সাহিত্য চর্চায় রত তারা স্বজাতীয় ভাষা ও বাংলায় সাহিত্য চর্চা করে থাকেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা বর্ণ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, বাংলা বর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে পাহাড়ি ভাষার অনেক শব্দ সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। বিকৃত হওয়ায় অর্থ পর্যন্ত বদলে যায়। মারমা ভাষার ক্ষেত্রে এ সমস্যা বেশি। অপরদিকে নিজস্ব বর্ণমালায় লেখা হলে পাঠক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কারণ নিজস্ব বর্ণমালার ব্যবহার স্ব স্ব জাতির মধ্যেও একেবারে হাতে গোনা। এ কারণগুলিকে মাতৃভাষায় সাহিত্য কর্ম সৃষ্টিতে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যে স্বল্প সংখ্যক সাহিত্য রচিত হচ্ছে তাও অধিকাংশ বাংলা হরফে। এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থের বিকৃতি ঘটে। বিকৃতি যদিই ঘটে থাকে তাহলে ভাষার পরিশীলিত রূপ যাকে আমরা বলছি সেটির প্রাপ্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। অপরদিকে নিজস্ব বর্ণমালায় লেখালেখি না হওয়ায় কোনো ভাষাতে অদ্যাবধি মানসম্পন্ন বানান রীতির প্রচলন করা সম্ভব হয় নি। চাকমা ভাষা ও বর্ণমালার ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি বেশি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে হলে চাকমাদের মধ্যে নিজস্ব বর্ণমালার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

ভাষা প্রসার ও বিকাশে বাধাসমূহঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী পাহাড়ি জাতিসমূহের ভাষাসমূহকে প্রসার ও বিকাশ করা এত সহজ কাজ মনে করার কারণ নেই। এর পেছনে যে সকল অনুঘটকগুলো রয়েছে সেগুলোকে সচল করতে হবে। ভাষাসমূহকে প্রসার ও বিকাশের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্ব স্ব জাতিগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। নিজের ভাষাকে নিজে চর্চা না করলে বাইরে থেকে যত চেষ্টা থাকুক না কেন সে ভাষাকে গতিশীলতায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যা অনুমিত হয় তা হচ্ছে-অধিবকাংশ ভাষাকে টিকিয়ে রাখার চেয়ে প্রসারের কাজটি অনেক দুরূহ। কারণ পাহাড়িরা তাদের ভাষাকে শুধুমাত্র কথ্যরূপে প্রকাশ করে থাকে, লেখ্যরূপ প্রকাশে ব্যবহার করে থাকে বাংলা ভাষা। সামাজিক যে কোনো কাজের আলোচনা স্ব ভাষায় করলেও সেগুলোর লিখিত রূপ দেয়া হয় বাংলা ভাষায়। এভাবে সচেতন বা অবচেতন মনে পাহাড়িরা নিজ মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে চলেছে শত শত বছর ধরে। যাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে তারাও সামাজিক কোনো লিখন কাজে বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোনো সময় তাদের বর্ণমালাকে ব্যবহার করেন নি। কথ্য রীতির বাইরে শিক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে পাহাড়িরা বাংলা ভাষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই লেনদেন,হিসাব-নিকাশ, পত্র যোগাযোগ, সামাজিক কোনো বিচারের সিদ্ধান্ত, স্থানীয় ক্লাব-সমিতির যাবতীয় যোগাযোগ সব কিছুই বাংলা ভাষায় করা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষা চর্চা করতে করতে অনেক পাহাড়ি ভাষার শব্দ তাদের শব্দ ভাণ্ডার থেকে হারিয়ে গেছে। ভাষা পরিবার একই হওয়ায় চাকমা ভাষায় অনেক বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, কোনো কোনো স্থলে পাহাড়ি শব্দ প্রয়োগ করলে সেটি নিজ সম্প্রদায়ের কাছেই অস্বস্তি লাগে। তাই সন্দেহ হয় যে, সরকারিভাবে চালু হতে যাওয়া মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে হয়তো বা অধিকাংশ পাহাড়ি নেগেটিভভাবে নিতে পারে। বাংলা ভাষার উপর পাহাড়িদের নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে তাদের ভাষার বিকাশ ও প্রসার হওয়ার সম্ভবনা একেবারে ক্ষীণ। এক্ষেত্রে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং প্রশাসনিক কাজে পাহাড়িদের ভাষাসমূহকে প্রয়োগ করার সুযোগ প্রদান করার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। অবশ্য বাংলা ভাষায় নির্ভরতার পেছেনে নানা কারণ রয়েছে। সরকারি পর্যায়ের কোনো স্তরে মাতৃভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্র না থাকায় পাহাড়িদের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব গৌণ হয়েছে। পাহাড়িদের ভাষা প্রসার ও বিকাশে সার্বিকভাবে আমরা নিম্নোক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করতে পারি।

* পরিবার কিংবা স্ব স্ব সমাজ ব্যতীত অন্য কোথাও মাতৃভাষা চর্চা ও ক্ষেত্র না থাকায় স্ব স্ব জাতিদের মধ্যে নিজ ভাষার প্রতি অবহেলা বিদ্যমান।
* যে কোনো বর্ণেই হোক ভাষাগুলোর লিখিত রূপদান বা প্রয়োগ না থাকা।

* ভাষাগুলোর সরকারি স্বীকৃতি না থাকা। সর্বোপরি ভাষাগুলোর বিকাশ ও প্রসারে সরকারি ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা কম থাকা।
* ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকের অভাব।
* প্রয়োজনীয় শব্দকোষ বা অভিধানের অভাব।
* মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের স্বল্পতা।
* মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য বা যে কোনো লেখনির পাঠকের অভাব।
* ভাষা সংরক্ষণ ও প্রসারে চিন্তাশীল লোকের অভাব।
* বর্তমান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবলের অপর্যাপ্ততা এবং দক্ষ জনবলের অভাব। ভাষা বিষয়ক কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিতভাবে পরিচালিত হওয়া।
* অধিকাংশ পাহাড়িদের মধ্যে মাতৃভাষার গুরুত্ব অনুধাবন না করা।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত ও কিছু প্রস্তাবনা পেশ করতে পারি।
* সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পাহাড়িদের বাধ্যতামূলকভাবে নিজ মাতৃভাষায় পড়াশোনা চালু করা।
* নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালায় শিক্ষা উপকরণগুলো তৈরি করা।
* পাহাড়িদের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক ও গবেষক নেই বললেই চলে। তাদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করার মত উপযুক্ত ভাষাতাত্ত্বিক তৈরির লক্ষে পাহাড়িদের মধ্যে থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ভাষাতাত্ত্বিক ও গবেষক তৈরি করা।
* সরকার নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো শক্তিশালী করা এবং জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা।
* প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ জনবল দিয়ে ভাষা বিষয়ক শাখা খোলা এবং অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
* পাহাড়ি ভাষার শব্দসমূহকে সংগ্রহ করা এবং অভিধান বা শব্দকোষ মুদ্রণ করা।
* পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান পাহাড়ি ভাষাকে অন্তত পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে সরকারি ও বেসরকারি অফিসে ব্যবহার করা এবং চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের আইনি অধিকার প্রদান করা। যেমন-কোনো চাকমার উদ্দেশ্যে যখন কোনো সরকারি বা বেসরকারি কিংবা এনজিও কার্যালয় থেকে চিঠি প্রেরণ করা হবে সে ক্ষেত্রে ঐ চিঠি চাকমা ভাষায় প্রেরণ করা। সংবিধানের ২৩(ক) অনুসারে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন পূর্বক এটি বাস্তবায়ন করা যায়। প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হলে পাহাড়ি জাতিদের ভাষাগুলো কোনোদিন বিলুপ্ত হবে না।
* পাহাড়ি জাতিদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
* দেশে ভাষা নীতি প্রচলন করা। ভাষা নীতির মধ্যে পাহাড়ি জাতিদের ভাষাগুলোর ব্যবহারকল্পে স্পষ্ট নীতিমালা থাকা।

উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ পাহাড়ি জাতি তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রক্ষার্থে এখনো সমর্থ (ক্যাপাবল) নয়। অধিকাংশ পাহাড়িকে দুবেলা আহার যোগার করতেই দিন, মাস ও বছর গড়িয়ে যায়। তার কাছে তার ভাষা, ঐতিহ্যগতভাবে লালিত সংস্কৃতি, রীতি-নীতির কোনো মূল্য ও গুরুত্ব নেই। যে কোনো উপায়ে দুবেলা আহার যোগার করতে পারলে সে বাঁচে। সে বুঝে না ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব। তাদের ভাষায় রয়েছে অসংখ্য মূল্যবান লোকসাহিত্য। রয়েছে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা প্রণালী এবং তন্ত্র-মন্ত্র। এ সকল মূল্যাবান লোকজ মানস সম্পদ অদ্যাবধি আমরা এখনো সংগ্রহে আনতে পারি নি। ভাষাগুলো বিলুপ্তি হলে একই সাথে এ সকল অমূল্য লোকজ মানস সম্পদ হারিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই দেশের বৈচিত্রতা রক্ষার্থে আমাদেরকে এগুলো সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। দেশের বৃহত্তর জাতি হিসেবে বাঙালিদের এগুলো সুরক্ষার্থে এগিয়ে আসতে হবে। নচেৎ কালের গর্ভে এগুলো বিলীন হয়ে যাবে। প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয় যে, তারা কেন অন্যের ভাষা, সংস্কৃতি কিংবা লোকজ সম্পদ রক্ষার্থে এগিয়ে আসবে? পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে আছে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় বাঙালি জাতির উপর আরো গুরু দায়িত্ব বর্তিয়েছে দেশের তথা সারা বিশ্বের মাতৃভাষা রক্ষার্থে দায়িত্ব পালন করার। এ দায়িত্বের অংশ হিসেবে বোধ করি ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি এ ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি জাতির ভাষাগুলো নিয়ে উল্লেখযোগ্য হারে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। বাংলা ভাষার পরে দেশে যে সকল ভাষাগুলো নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোও ভাষা বিষয়ক কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদনে এগিয়ে আসবে এ প্রত্যাশা সচেতন সকলের।

* শুভ্র জ্যোতি চাকমা, গবেষণা কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি। shuvrachakma71@yahoo.com

আজাদ বুলবুল

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ঃ রাজমালার সমাজচিত্র

বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ত্রিপুরারা হচ্ছে তৃতীয় বৃহত্তম জনজাতি। পাহাড়ি জনপদ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে তাদের জনবসতি স্বল্প হলেও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় এদের বেশিরভাগের বসবাস। বর্তমানে তাদের জনসংখ্যা দেড়লাখের কাছাকাছি। তিব্বতী বর্মণ ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য শাখা 'ককবরোক' তাদের মাতৃভাষা। তারা মঙ্গোলয়েড জাতিগোষ্ঠীর শাখাবিশেষ। ধর্মীয় পরিচয়ে তারা সনাতন ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দুধর্মের অনেক দেবদেবীর সাথেই ত্রিপুরাদের দেবদেবীর মিল নেই। তাছাড়া ত্রিপুরাদের এমন কিছু ধর্মীয় আচার প্রথা ও দেবকল্পনা আছে যা একান্তভাবে আদিম সংস্কৃতিচেতনা থেকে উদ্ভুত। বাংলাদেশের সিলেট, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় তাদের স্বল্পসংখ্যক বসতি লক্ষ্য করা গেলেও এ জনজাতির বৃহৎ অংশটি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে। ত্রিপুরা থেকে ঠিক কখন কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, 'উর্বর জুমভূমির অনুসন্ধান তাদেরকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জনপদে বসবাসে উদ্বুদ্ধ করেছে'।[১] একদা সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল ত্রিপুরাদের শাসনাধীন ছিল। সে সময় ত্রিপুরাদের অনেকেই এসব যায়গায় বসতি স্থাপন করে। পরে কেউ কেউ ত্রিপুরায় ফিরে গেলেও অনেকেই রয়ে যায় পূর্বতন ঠিকানায়।

ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের ইতিহাস হাজার বছরের অধিককালের। তাদের দাবী একমাত্র তারাই তাদের অতীত ইতিহাসের বিশ্বস্ত বিবরণ সংরক্ষণ করেছে *'রাজমালা'* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রায় আটশ বছর ধরে রচিত হয়ে আসা এই রাজমালা হচ্ছে ত্রিপুরা জাতির অতীত ইতিহাসের একমাত্র ধারাবাহিক দলিল। এ গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের শৌর্যবীর্যের বীরত্বগাঁথা সংকলিত হয়েছে। রাজ্যপাট, যুদ্ধবিগ্রহ, সমর অভিযান, রাজসভার বৈভব-জৌলুস, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সিংহাসনের লড়াই, ক্ষমতালোভীদের কূটকৌশল ইত্যাদি বিষয়গুলো রাজমালার পাতায় পাতায় জড়িয়ে আছে। সে কারণে সমালোচকদের ধারণা, রাজমালা কেবল রাজাদের ইতিহাস; প্রজাদের বৃত্তান্ত সেখানে অনুপস্থিত। বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য হচ্ছে রাজমালার পরিচিতি জ্ঞাপন করে এর ভেতর সমকালীন ইতিহাসের যে চিত্রাবলি ধরা পড়েছে তার পরিচয় তুলে ধরা।

ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব ইতিহাসের মুদ্রিতরূপ হচ্ছে রাজমালা। শ্রীযুত কালিপ্রসন্ন সেনের মতে, *'রাজমালা বলিতে যাহা প্রচলিত, তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং*

বাঙালা পদে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় রাজমালা রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবন বৃত্তান্ত হইতে বর্ণিত আছে; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই। রাজরত্নাকর নামে ত্রিপুরা রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস সংরক্ষিত আছে। এটি রাজা ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল হইতে রচনা আরম্ভ হয়। সেই রাজরত্নাকরে আরেকটি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রাজমালার উল্লেখ আছে যদিও সেটি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়নি'।[২]

রাজমালা ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে প্রকাশিত হলেও দাবী করা হয়, এর ভিত্তি হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ রাজাবলীর তথ্য। *'পঞ্চদশ শতকে দু'জন ব্রাহ্মণ পন্ডিত শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর কর্তৃক রাজমালা সংগৃহীত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় ধারাবাহিকভাবে রক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ের তথ্যাবলীও অন্যান্য পন্ডিতরা সযত্নে রক্ষা করে গেছেন'*।[৩] ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস সংস্কৃত রাজরত্নাকর বা বাংলা রাজমালা এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে ত্রিপুরা রাজবংশ ক্ষত্রিয় তো বটেই মহাভারতে উল্লেখিত রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহুর বংশ বলে দাবী করা হয়েছে। *'বুঝতে ভুল হয় না এর মূলে মহাভারতসহ অন্যান্য গ্রন্থের প্রভাব বিদ্যমান'*।[৪] এ দাবীর প্রধান উদ্দেশ্য ত্রিপুরা রাজবংশকে এই উপমহাদেশীয় ভাবধারায় সম্পূর্ণ আত্তীকরণ ও সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে তার গুরুত্ব , প্রাচীনত্ব, কর্তৃত্ব ও সম্মান উচ্চতর পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করা।

রাজমালা ত্রিপুরা রাজ্যের বহু অতীত তথ্যে সমৃদ্ধ। এতে কল্পনা বিলাস, অতিরঞ্জন ও পক্ষপাতদুষ্টতা নির্বিচারে স্থান পেয়েছে। রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে, *'ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচন মহাভারতে বর্ণিত প্রথম পান্ডব যুধিষ্টিরের সমসাময়িক ছিলেন। ফলে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেও এ রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। অথচ তার সমর্থনে রাজমালায় কোন যুক্তি প্রমানের উল্লেখ নেই'*।[৫]

রাজমালা কাব্যগ্রন্থটি ত্রিপুরা নৃপতিগণের আজ্ঞায় রাজ কবিগণ রচনা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এর প্রতিটি পংক্তিতে রয়েছে রাজার প্রশস্তি ও জয়গানের মধ্যে রাজ্যের সীমা, ভৌগোলিক অবস্থান, রাজ্যশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ, জয়-পরাজয় মূখ্য হয়ে উঠেছে। জনসাধারণ কিংবা জনসমাজ বড়োই দূলর্ভ। তবে রাজমালা ত্রিপুরা রাজ্যের গন্ডি ছেড়ে চট্টগ্রাম, কসবা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, সিলেট, নোয়াখালী ও চাঁদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

রাজমালা ৬টি পুঁথিতে বিন্যস্ত। বিভিন্ন রাজার আমলে এটি রচিত হয়েছে। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির ব্যবধান প্রায় একশ বছর। এভাবে পুঁথিগুলো রচিত হয়েছে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। এতে কবিতার ছন্দে ত্রিপুরার রাজেন্যবর্গের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথমবার রাজমালা সম্পাদনা করেন বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ। দ্বিতীয় বার সম্ভবত শেষবার তা সম্পাদনা করেন শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন। কৈলাস সিংহ ও কালীপ্রসন্ন সেনের আগেও রাজমালা সম্পাদিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্বের প্রণেতা দুর্গামনি উজির পূর্ববর্তী চারটি খন্ড সম্পাদনা করে থাকতে পারেন। ফলে 'আদি রাজমালা নিঃসন্দেহে সংশোধিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। *'আদি রাজমালা এখনো আগরতলা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে'*।[৬]

রাজমালা ৬টি পর্বে বা লহরে বিভক্ত। প্রথম লহরে দৈত্যরাজ থেকে মহামাণিক্য পর্যন্ত রাজ্যপাটের বিবরণ। দূর্লভচন্দ্র নারায়ণ, শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর কর্তৃক পঞ্চদশ শতকের শুরুতে মহারাজ ধর্মমাণিক্যের আজ্ঞায় এ পর্বটি রচিত হয়। দ্বিতীয় লহরের বিষয়বস্তু ধর্মমাণিক্য হতে জয়মাণিক্য পযর্ন্ত রাজা ও রাজ্যপাটের বিবরণ। ষোড়শ শতকের শেষভাগে মহারাজ অমরমাণিক্যের নির্দেশে কবি রণচতুর নারায়ণ এটি রচনা করেন। রাজমালার তৃতীয় লহর সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের নির্দেশে রাজমন্ত্রী কর্তৃক রচিত হয়। এতে অমর মাণিক্য থেকে কল্যাণ মানিক্য পযর্ন্ত রাজাদের বর্ণনা রয়েছে। চতূর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ লহর রচিত হয়েছে যথাক্রমে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ, ঊনবিংশ শতকের শুরূন্ন ও মধ্যভাগে। এতে যথাক্রমে গোবিন্দমাণিক্য থেকে কৃষ্ণমাণিক্য, রাজধর মাণিক্য থেকে রামগঙ্গা মাণিক্য, এবং রামগঙ্গা মাণিক্য থেকে কাশীচন্দ্র পযর্ন্ত রাজেন্যবর্গের রাজ্যপাটের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ খন্ডগুলো রচনা করেছেন যথাক্রমে রাজমন্ত্রি জয়দেব ও উজির দূর্গামনি। রাজমালার শেষ লহরটি রচিত হয়েছে মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের নির্দেশে।

কালীপ্রসন্ন সেন বলেছেন- রাজমালা রাজাগণের ইতিহাস, রাজ্যের ইতিহাস নয়। ইতিহাসের উৎস নানা ঢঙের হতে পারে। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্য থেকে বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। রাজমালার বিভিন্ন পুঁথিকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিবরণ সম্বলিত কাব্যময় ইতিহাসের উৎস হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। রাজমালায় কেবল ত্রিপুরার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এমন নয়, এতে গৌড়, নোয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রামসহ আরো অনেক যায়গার বিক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

'১৮৯৬ সালে সংকলিত শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় ১৭৮ জন রাজার নাম পাওয়া যায়'।[৭] রাজন্যবর্গের তালিকা প্রসঙ্গে ড. লীচ বলেন, *'এ তালিকা সত্য-মিথ্যায় প্রণীত কিন্তু সত্য কোন যায়গায় মিথ্যা হয়ে গেছে তা স্থির করা দুষ্কর'*।[৮] তবে রাজমালাকে আমরা যে ভাবেই পাই না কেন বাংলাভাষায় এটিই প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ।

ত্রিপুরার রাজেন্যবর্গের আদি পুরুষ কে– এ সমস্যা সমাধান করার জন্য আদি রচয়িতাদের কাছে প্রাচীন কোন তথ্য ছিলো না। সেকারণে *'তারা শরণাপন্ন হয়েছেন প্রাচীন পুরাণ কাহিনী, কিংবদন্তী, লোকগাঁথা, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থেরও'*।[৯] রাজকাহিনীর পুরাণ নির্ভর অংশটির কোন তথ্য উপাত্তের প্রামাণিক নিদর্শন নেই। *'এর প্রায় পুরোটাই কল্পনাশ্রয়ী ফ্যান্টাসী, গ্রীক পুরানের ন্যায় পৌরাণিক কাহিণী নির্ভর কাব্যগাঁথা'*।[১০]

পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায়, শোকে দুঃখে হর-পার্বতীর মৃতদেহ মাথার উপর নিয়ে ঘুরপাক খেয়েছিল তাতে পার্বতীর দেহ খন্ডবিখন্ড হয়ে ভারতের বিভিন্ন যায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। একটা খন্ড সীতাকুন্ড পাহাড়ের চূড়ায় পড়েছিল বিধায় সেখানে চন্দ্রনাথ মন্দির স্থাপিত হয়। পার্বতীর বাম পা টি পড়েছিল ত্রিপুরাতে। তার উদ্বৃতি আছে রাজমালার প্রথম লহরে–

সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।
ত্রিপুরসুন্দরী খ্যাত ত্রিপুর ভূমিতে ॥
ত্রিপুরেশ নাম শিব ত্রিপুরা রাজ্যেতে।
তান বরে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্মীতে ॥
(রাজমালা, প্রথম লহর, পর্বঃ ত্রিপুর বংশের আখ্যান)

'ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য হারিয়ে বহুদিন অরণ্য জংগলে বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। পরে রাজ্য ফিরে পেয়ে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে চন্দ্রনাথ মন্দির নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন'।[১১] তিনি চট্টগ্রাম থেকে দেবমূর্তি তুলে নিয়ে ত্রিপুরায় স্থাপন করে ত্রিপুরাসুন্দরী নামে অধিষ্ঠিত করেন।

রাজমালার সমাজচিত্র ঃ

রাজমালার মত সুবিশাল মহাকাব্যিক গ্রন্থ ত্রিপুরার নৃপতিদের শৌর্য বীর্যের বর্ণনায় ভারাক্রান্ত হতে পারে না। তাতে কিছু সামাজিক ধর্মীয় রীতি-নীতি, কিছু আবেদন আকাঙ্খার বর্ণনা থাকতেই পারে। রাজমালার সর্বত্র যদিও রাজাদের গদিনসীন হওয়া, রাজ্যচ্যুতি, সমর কাহিনী, শাসন বিবরণী, রাজপরিবারের আত্মকলহের বর্ণনা পাওয়া যায় ; এসব কিছু ছাড়িয়ে রাজ্যের সামাজিক বৃত্তান্ত যে একেবারেই পাওয়া যায়না - তা নয়। রাজমালার ঐতিহাসিকরা রাজার কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাটের কথা, রাজ্যের অধিবাসীদের কথা বিস্মৃত হননি।

'কাইফেঙ্গ চাকমা আর খুলঙ্গ লঙ্গাই।
তনাউ, তৈয়ঙ্গ তার রয়াং আদি ঠাঁই ॥
থানাচিং প্রতাপসিংহ আছে যত দেশ।

লিকা নামে আর রাজা রাঙ্গামাটি শেষ' ॥[১২]

রাজমালার জনপদ ঃ

রাজমালা গ্রন্থে বহু চেনা অচেনা জনপদের নাম পাওয়া যায়। কালের বিবর্তনে এসব জনপদের অনেকগুলোই হারিয়ে গেছে। অনেকগুলো এখনো টিকে আছে স্বনামে অথবা বিবর্তিত নামে। রাজমালায় যেসব স্থান বা জনপদের নাম পাওয়া যায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে সেগুলো হচ্ছে- আগরতলা, আচরঙ্গ, কাইচরঙ্গ, কাইফেঙ্গ, কামাখ্যা, কাশী, কিরাতদেশ, কুরুক্ষেত্র, কলংমা, খুড়িমুটা, খুলঙ্গ, গৌড়, চাখমা, ছাম্বুল নগর, জয়ন্ত্মা, ত্রিপুরা, ত্রিবেগ, থানাচিং, দ্বারিকা, ধম্মনগর, প্রতাপচি, প্রায়াগ, প্রাগজ্যোতিষ, বঙ্গ, শদুগ্রাম, মায়া, মেহেরকূল, মথুরা, বিশালগড়, বর্ব্বর, মনিপুর, যশপুর, রত্নপুর, রয়াং, *'রাঙ্গামাটি (উদয়পুরের পূর্ব নাম)'*,[১৩] রাজনগর, লঙ্গাই, চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড, রামু, দোহাজারি, লিকাপাড়া, সমর, স্বর্নগ্রাম, হরিদ্বার, হস্ত্মিনা, হীরাপুর, হেড়ম্ব ইত্যাদি।

বিভিন্ন শ্রেনি ও পেশার মানুষ :

বলা হয় রাজমালা জনসাধারণের ইতিহাসে ঋদ্ধ নয়। কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। এখানে মাঝে মাঝে উঁকি মেরেছে সাধারণ মানুষ। রাজাদের কথা বলতে গিয়ে প্রজাদের পরিচয় লুকাতে পারেননি লেখকগণ। রাজমালায় যে সব সাধারণ মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা রাজসভা বা রাজপ্রসাদের অন্দর মহলের কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত। *'রাজমালায় রাজেন্যবর্গের বাইরে পেশাজীবী যেসব লোকের পরিচয় আমরা পাই তারা হলো- বাছাল, সিউক, কুইয়া, তুইয়া, দুইসিং, হুজুরিয়া, ছিলটিয়া, আপাইয়া, ছত্রতুইয়া, গালিম, সুবে, নারায়ন এবং সেনা'*।[১৪]

সংখ্যাভিত্তিক স্থানের নাম ঃ

ত্রিলোচন খন্ডে বর্ণিত হয়েছে ত্রিলোচনের বিবাহ প্রসঙ্গ। দীর্ঘ বর্ণনায় এ অংশে ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত্ম উল্লেখিত হয়েছে। ত্রিলোচনের বার পুত্রের নামানুসারে একদা ত্রিপুরার নামকরণ হয় 'বারঘর ত্রিপুর'। রাজমালার যুগে সংখ্যার উপর ভিত্তি করে স্থানের নামাকরণ করা হতো। যেমন- ষোলঘর, বারঘর, আড়াই হাজার, চরদুয়ানী, দোহাজারি, তিনদুয়ার, পঞ্চগড় ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ঃ

রাজমালার দ্বিতীয় লহরে ব্রাহ্মণ চাতুর্যের কারণে অনেক রাজার যে অপযশ ঘটেছে তার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। বিজয় মাণিক্য খন্ডে দেখা যায় - বিজয় মাণিক্য চট্টগ্রাম অভিমুখে অভিযান শুরু করলে পথিমধ্যে পাঠানদের সাথে তার বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আট মাস যুদ্ধ শেষে পাঠান আধিপত্যের পতন ঘটলো ত্রিপুরাধিপতির হাতে। পাঠান অধিপতি

মমরাক খাঁ কে ত্রিপুরা সৈন্যরা বন্দি করে বিজয় মাণিক্যের সমীপে নিয়ে এলে। বন্দি মমরাক খাঁ সালাম করেনি এবং যথাযথ সম্মান জানায়নি, ব্রাহ্মণদের এমনি অনুযোগের কারণে রাজা অপমানিতবোধ করলেন। বীরযোদ্ধা মমরাক খাঁ কে শাস্ত্মি দেবার কোন ইচ্ছা রাজার ছিলনা, কিন্তু ব্রাহ্মণরা রাজাকে মন্ত্রনা দিলেন মমরাক খাঁ কে চর্তূদেশ দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া যায়–

নৃপতির ইচ্ছা আছে না বধিতে তাকে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যা যে মত যে থাকে ॥
দুর্লভ চন্ত্মাই নাম রাজাতে সে কহে।
চতূর্দ্দেশ দেব বলি খাঁকে দিব তাহে ॥
মমরাক খাঁ কে হত্যা করা হলে গৌড়ের রাজা ত্রিপুরাধির প্রতি ভীষণ কুপিত হন।

সহমরণ প্রথা ঃ

রাজমালার বিভিন্ন বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন সমাজে সহমরণ প্রথা বেশ জোরেসোরে চালু ছিল। প্রতাপশালী সম্রাট ধন্যমানিক্য শেষবয়সে বসন্ত্ম রোগে মারা গেলে রানী মহাদেবী কমলা জীবন্ত্ম তার সহগামী হয়েছিলেন। এছাড়া ধর্মমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য বর্ণচোরা ব্রাহ্মণ ঘাতকের হাতে নিহত হলে তার স্ত্রীকেও তার সাথে আগুনে পুড়ে সহমরণে যেতে হয়েছিল।

অনুশোচনা ঃ

ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর সিংহাসনের লোভে তার পুত্ররা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। একপুত্র শিক্ষরাজ নরমাংস ভক্ষণ করে লজ্জায় রাজ্য ত্যাগ করেছিলো। রাজমালায় বর্ণিত কাহিনীটি হচ্ছে- শিক্ষরাজ সিংহাসনে আরোহনের পর একদা শিকারে গিয়ে কোন শিকার না পেয়ে সঙ্গীদের উপর ভীষণ কুপিত হন। শেষ অনুচরদের আদেশ দিলেন-যেভাবেই হোক তার খাবারে মাংসের যোগান দিতেই হবে। ক্ষুধার্ত রাজার রাগত ভঙ্গীতে ভীত হয়ে পাচক অষ্টমীর নরবলি দেয়া মানুষের মাংস রেঁধে রাজাকে খেতে দিল। অতি সুস্বাদু রান্নাকরা মাংস খেয়ে রাজা তা কিসের মাংস জানতে চাইলে ত্রস্ত্ম পাচক কম্পিত হয়ে বলতে লাগল–

'মাংস না পাইয়া ভয়েতে করেছি কু কর্ম।
মানুষের মাংস দিয়া করিলা অধর্ম ॥
তারপর–
কম্প হৈল নরপতি বৃত্তান্ত্ম শুনিয়া।
পাপ কম্ম কৈলা কেনে আমা ভয় পাইয়া ॥

অবশেষে রাগে, লজ্জায়, দুঃখে শিক্ষরাজ ঘোষণা করলেন–
আর না করিব আমি রাজ্যের পালন।
যোগ সাধনাতে আমি চলি যাব বন' ॥[১৫]

নরবলি ঃ
সে যুগে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ত্রিলোচনের সময় নরবলি একটি সাধারণ প্রথা হিসাবে বিবেচিত হত। নরবলির মাংস অজান্তে ভক্ষণ করাও গর্হিত কাজ হিসাবে গণ্য হতো। গৌড়রাজার বাহিনীকে পরাজিত করা উপলক্ষে আয়োজিত আনন্দ উৎসবে নরবলি দেয়ার উল্লেখ রাজমালাতে আছে। রাজা ধন্যমাণিক্যের আমলের ঘটনা। মোগল- পাঠান সৈন্যদের কোনভাবে কাবু করতে না পেরে রাজা ধন্যমানিক্য গোমতী নদীর উজানে রাতারাতি বাঁধ দিয়ে ফেললো। নদীর পানি কমে যাওয়ায় গৌড় বাহিনী গোমতীর তীরে জলের কাছাকাছি যায়গায় নিরুদ্বিগ্ন ভাবে শত্রুপক্ষের অপেক্ষায় ছিল। এক গভীর রাতে গৌড়বাহিনী যখন নিদ্রামগ্ন হঠাৎ ধন্যমাণিক্য বাঁধ খুলে দিলে প্রচন্ড জলস্রোতের নীচে পড়ে গৌড়বাহিনী পর্যদুস্ত ও পরাজিত হয়। এতে রাজ্যে সুখের বন্যা বহে যায়। ধন্যমাণিক্যের রাজ্যে নরবলি নিষিদ্ধ হলেও বিজয় উৎসব উপলক্ষে দুটি নধর বালককে নরবলি দেয়া হয়। রাজা ত্রিহুত দেশ থেকে নাচে গানে পটিয়সী নটীদের এনে ত্রিপুরার সকলকে আনন্দিত করেছিল। ত্রিপুরার অনেক কলারসিক তাদের কাছ থেকে নাচগান শিখে নিল। রাজমালায় নরবলি প্রথা নিষিদ্ধ করার কথা এভাবে লিখিত আছে–

শ্রী ধন্য মাণিক্য রাজা যুদ্ধে জয় পাইয়া।
চতূদ্দেশ দেব পূজে বিধি বলি দিয়া ॥
পূর্ব্বেতে ত্রিপুরা রাজা নরবলি দিত।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ কাটা যাইত ॥
শ্রী ধন্য মাণিক্য মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হৈল ॥

রানী ঃ
রাজমালার দ্বিতীয় লহরে রাজেন্যবর্গের পাশাপাশি কয়েকজন রানীর উল্লেখ আছে। যেমন-

বিজয় মাণিক্য নাম হৈল নরপতি।
তাহান মহাদেবী নাম ছিল পূণবতী ॥
আবার অন্য যায়গায়–
হীরাপুরে লক্ষ্মীরানী বনবাস সেবী।
পরে রাজা বিভা করে আর মহাদেবী ॥
প্রধান্ত পাত্র মিত্র রাজাকে কহিল।
কতদিন পরে রাজা লক্ষ্মীরানী নিল ॥

রাজমালায় আরো কয়েকজন রানীর উল্লেখ থাকলেও তাদের কোনরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

নারীলোভী মানসিকতা ঃ
ত্রিপুরার রাজধানীর নাম ছিল রাঙ্গামাটি। মহারাজ উদয় মাণিক্য ১৪৯৪ শকে সিংহাসনে আরোহন করে রাজপ্রসাদ চন্দ্রপুরে স্থানান্তর করেন। রাজধানী রাঙ্গামাটির নাম বদলে নিজের নামানুসারে নতুন নামাকরণ করেন উদয়পুর। উদয় মাণিক্য সম্পর্কে রাজমালায় বহু বদনাম লেখা আছে। তার প্রাসাদের অভ্যন্তরে দুইশত চল্লিশজন নারী রক্ষিতা ছিল। এছাড়া গ্রাম গঞ্জ থেকে গৃহস্থ কন্যাদের অপহরণ করে নিয়ে আসা হতো। উদয় মাণিক্যের পুত্রগণও নারী বিলাসী ছিল। সেনাপতি ছিল চরিত্রহীন লম্পট। সামান্য অপরাধে রাজবংশের যে কাউকে উদয় মাণিক্য হত্যা করতো। তার দুঃখজনক মৃত্যু সম্পর্কে রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে–

চৌদ্দশ আটানব্বই শকেতে তখন।
পারার গুটিকা রাজা করিলা ভক্ষণ ॥
স্ত্রী লোভে গুটিকা রাজা ভক্ষে অকস্মাৎ।
অন্ডকোষ ফাটি রাজা মরিলা পশ্চাৎ ॥
পঞ্চ বছর রাজত্ব করিয়া শাসন।
এই মতে মরিল উদয় মাণিক্য রাজন ॥

উপসংহার ঃ
রাজমালা বা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে যে কথাগুলো অতি প্রচলিত সেটি হচ্ছে- রাজমালা রাজাদের কাহিনী, রাজ্যের বৃত্তান্ত নয়। রাজমালার সম্পাদক শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ এবং শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন ছাড়াও অনেকেই রাজমালা নিয়ে গবেষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও আগরতলায় অনেকগুলো গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কোন গবেষণাতেই বলা হয়নি রাজমালা গণমানুষের জীবনাচারণের ইতিবৃত্ত। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণে মনে হয় এতে রাজ বৃত্তান্তের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের পরিচয়, জনপদের নাম ও সমকালীন বিভিন্ন রীতি নীতির বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে রাজাদের জীবন বৃত্তান্ত যেমন আছে তেমনি আছে সে সময়কার প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সামাজিক আইন কানুন, ধর্মীয় অনুশাসন, নরবলির মত নিষ্ঠুর রীতি-প্রথা। সতীদাহ সেকালে সর্বজনের পালনীয় প্রথা হিসাবে বিবেচিত হতো। ত্রিপুরার রাজারা ধর্মের কঠিন অনুশাসন হিসাবে এটি পালন করতো। রাজারা যে সব রীতি-কানুন পালন করতো প্রজারাও সে সব পালন করতে বাধ্য থাকতো। নরবলির বিষয়টি ছিল আরো ভয়ঙ্কর। সাধারণত কিশোর বালকদের নরবলির জন্য উপযুক্ত মনে করা হতো। যুদ্ধ বন্দিদের বলি দেয়াকে অনেকেই সঙ্গত মনে করতো।

সেকালে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, মোহন্ত, কাপালিকরা ছিল গ্রাম সমাজের ত্রাস। তারা যা যা বলত-সে সব কথা সবাই ধর্মজ্ঞানে মেনে নিত। কোন কুমারী মেয়েকে ভুতে ধরেছে বলে প্রচারিত হলে তাকে চিকিৎসার নামে পুরোহিতরা ধর্ষণ করলেও সমাজ সেটাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিত। ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতদের নির্দেশ অমান্য করার শক্তি বা সাহস রাজমালার যুগে কোন মানুষের ছিলনা।

আসলে রাজমালার মত সুবিশাল ও মহাকাব্যিক গ্রন্থটি কেবলমাত্র ত্রিপুরার নৃপতিদের শৌর্য বীর্যের বর্ণনায় ভারাক্রান্ত নয়। নিবিড় পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় এতে সে কালের বহু সামাজিক রীতি নীতি ও কিছু আবেদন আকাঙ্খার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।
তথ্য নির্দেশ ঃ

১. আজাদ বুলবুল, *খাগড়াছড়ির ত্রিপুরা নৃ–গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি ২০১০*, পৃ- ২৪
২. নুরুল ইসলাম বিএসসি, *রাজমালায় চট্টগ্রাম*, কালবিহীন, পৃ -৫।
৩. সলিল রায়, *ত্রিপুরা জাতির পূর্ব পরিচয়, পূব ই রাবাইনি সাল*, ১৯৮১, পৃ -১৫৮।
৪. সলিল রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ -১৮৫।
৫. সলিল রায়, **প্রাগুক্ত,** পৃ -১৮৫।
৬. নুরুল ইসলাম বিএসসি, *রাজমালায় চট্টগ্রাম*, কালবহীন, ভূমিকা।
৭. মুস্তাফা মজিদ, *ত্রিপুরা জাতি পরিচয়*, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ -৪৩।
৮. রালফ লীচ, উদ্ধৃতি, সলিল রায়, আইতারামা, বরেন ত্রিপুরা সম্পাদিত, *ত্রিপুরা উপজাতি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংসদ*, পৃ -১৮৭।
৯. মুস্তাফা মজিদ, ২০০৮,*প্রাগুক্ত*, পৃ -১৮।
১০. মুস্তাফা মজিদ, ২০০৮, *প্রাগুক্ত*, পৃ -৪১।
১১. নুরুল ইসলাম বিএসসি, *প্রাগুক্ত*, পৃ -৪।
১২. শ্রী শ্রী রাজমালা, *ত্রিলোচন দিগ্বিজয় খন্ড*, উদ্ধৃত, *ত্রিপুরা জাতি পরিচয়*, মুস্তাফা মজিদ, ২০০৮, পৃ -২২৮।
১৩. নুরুল ইসলাম বিএসসি, *প্রাগুক্ত*, পৃ -২৩।
১৪. নুরুল ইসলাম বিএসি, *প্রাগুক্ত*, পৃ -২২।
১৫. *শ্রী শ্রী রাজমালা, প্রথম লহর, ত্রিলোচন খন্ড*, উদ্ধৃত, *ত্রিপুরা জাতি পরিচয়*, মুস্তাফা মজিদ, ২০০৮, পৃ -২২৮।

.....

আজাদ বুলবুল (ড. গাজী গোলাম মাওলা), গবেষক, কথাশিল্পী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম।

প্রগতি খীসা

সাহিত্য, সমাজ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য চর্চা

সাহিত্য ও সমাজ দু'টি আলাদা বিষয় হলেও একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল। সাহিত্যের মাল মশলা সংগৃহীত হয় সমাজ থেকে বা সমাজ থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। অপরপক্ষে সামাজের অগ্রগতি সাহিত্যের পুরিপুষ্টির উপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল। একই অর্দশবাদী ও ধ্যানধারণার মতাবলম্বী সমষ্টিপাত জনগোষ্ঠিই সমাজ। এই সমাজবদ্ধ নর-নারীর আশা আকাঙ্খা চ্যুতি বিচ্যুতি, ঘটন-অঘটনের রেখাপাত হয় সেই সমাজেরই সাহিত্যে। এতটুকু বললেই সাহিত্যে ও সমাজ এ দু'টি জিনিসের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও প্রভাবের গুরুত্ব বোঝা যাবেনা। এ'টি বুঝতে হলে বিষয়টির আরো গভীরে যেতে হবে।

ভূ-গর্ভের খনির অবস্থান যেরূপ সাহিত্যের স্বরূপ ও তাই। আকরিক লোহা বা অন্যান্য মৌলিক ধাতব পদার্থ ও শিল্প কারখানার কাজে অপরিহার্য। খনিজ সম্পদের বদৌলতে সৃষ্টি হচ্ছে-ভাষ্কর্যের প্রতিকৃতি। তেমনি ভাবে সাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করে পাওয়া যায় অমৃত পানীয়। যে অমৃত সমাজের চেহারাকে বদলে দেয় সমাপজদেহ পরীক্ষিতি সালসার মতোই। সাহিত্যের খনি এমনিভাবে আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে শিল্প ও চিন্ত্মা জগতের নতুন নতুন ইমারত তৈরি করার। খনির সঙ্গে সাহিত্যের তুলনার অন্য একটি সুবিধা এই যে, খনি থেকে সংগৃহীত আকরিক দ্রব্যাদি যেমন প্রত্যক্ষভাবে ঘর কারখানা করার কাজে লাগে তেমনিভাবে দূর দূরান্ত্মরের মহাশূন্যের ওপারে রকেট ও অন্যান্য উপগ্রহাদি প্রেরণের কাজও অত্যাবশ্যকভাবে প্রয়োজন। এইতো গেলো খনিজ বস্তুর ব্যবহারিক দিক। সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে এরও দুটো দিক আছে। একটা প্রত্যক্ষ এবং অন্যটি পরোক্ষ। সাহিত্যের সাময়িক আনন্দ, পরিতৃপ্তি লাভ বা রসআলো আস্বাদই এর প্রত্যক্ষ দিক। পরোক্ষ দিকের সীমানা আরো বিস্তৃত, আরো গভীরতম। সেটা হচ্ছে তার বিপ্লব। সাহিত্যের এমন একটি সহজ শক্তি রয়ে গেছে যার সাহায্যে ও সমাজেরই প্রতিটি ক্ষেত্রে আনা যায় চিন্ত্মাধারার গুঢ় আবর্তন। আর বিপ্লবের সেই আবর্তনকেই পরীক্ষিত সালসার আখ্যা দিতে চেয়েছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মূলে ছিল সাহিত্যের এমনি এক পরোক্ষ দিকের সক্রিয়তা। এই পরোক্ষ ফল ভাব বিপ্লব সেই দিন আমাদের রাজনৈতিক কর্মভূমিতে প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করেছিল। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত্ম সময়ের এই বিস্তৃত পরিসরে হয়েছিল এমনি এক মৌলিক চিন্ত্মা আবর্ত যা পরবর্তীতে মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের চুড়ান্ত্মরূপ লাভ করে। এটা এসেছিল সাহিত্যের মাধ্যমে তদানিন্তন সমাজ সেবী ও কবি সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। এক্ষেত্রে মহাকবি ইকবাল, বিশ্বকবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি নজরুল, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যাঁদের মাথায় ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং সর্বশেষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জনমত

গড়ে উঠে তাঁদের আপন সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে। জাতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলন অপরিহার্য। কবি সাহিত্যিক এবং লেখক বুদ্ধিজীবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা পারেন জাতিকে নব প্রেরণা যোগাতে এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্খার লালিত বাস্ত্মবে রূপ দিতে। সমাজ সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় অন্যভাবে ও ব্যক্তিক মানুষের আনুকরণে স্বতস্কুত আলোড়ন সৃষ্টি করেও সেখানে মৌলিক সত্ত্বার জ্যোতি: বিকিরণ করে। সাহিত্য ও সাংস্কৃতির আন্দোলন সমাজের অলিতে পলিতে নিয়ে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অভূত সংস্কার।

মানব সমাজ নীচু স্তর থেকে উচু স্ত্মরে অগ্রসর হতে থাকে, তেমনি ব্যক্তিত্ব মানুষের পরিবর্তন হয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ। এইভাবে পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা ও অভিব্যক্তির দিকে অগ্রসর হতে হতে এক সময় মানুষ আপন ধ্যানধারণা ও আশা আকাংখাকে ধরে রাখতে চায় চির অমর করে। ঠিক এমনি এক উদ্দেশ্য নিয়েই সর্ব প্রথম সাহিত্যের বীজ অংকুরিত হয়ে। কেউ যদি বলে সাহিত্যের বালাই আমার নেই। নিজের সামর্থ্য অনুসারে যা উর্পাজন করলাম তাই ভোগ করতে থাকবো। তার মানে সাহিত্যেকে উপেক্ষা করে নিতানুই বৈষয়িক বস্তুকে নিজকে ব্যাহত রেখে যদি জীবন কাটিয়ে দিতে চায় তারা অনায়াসে পারে। সাহিত্য ও বিভিন্ন শিল্পকলাকে তারা জীবন যাত্রা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারে। তেমনিভাবে তারা বেঁচে থাকবে যেমনিভাবে বেঁচে ছিল সাহিত্য ও শিল্পকলা বির্বজিত আদিম মানব সমাজ।

অনেকে বলতে পারেন বিংশ শতাব্দীতেও দেখেছি অনেকে সাহিত্যের ধার মোটেই ধারেননি। কিন্তু একটু চিন্ত্মা করে দেখলেই দেখা যায় তারা এককভাবে না হয়তো অন্যভাবে দৈনন্দিন জীবনে সাহিত্যের রসই আস্বাদন করেছেন। সাহিত্যের যতখানি যুগিয়েছে তার চেয়ে বেশী যুগিয়েছে জাতীয় জাগরণের মূলমন্ত্র বাস্ত্মবায়িত করার দূর্জয় সংগ্রামের অফুরন্ত্ম জীবনী শক্তিকে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজকে অচিন্ত্যনীয়ভাবে পরির্বতন করতে পারে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলা ভাষাকে ও বাঙালীর জাতীয় জীবনকে বিকশিত করার জন্য বঙ্কিম চন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহের রচনা এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপন্যাস বুলেটের মতো কাজ করেছিল। তেমনিভাবে বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা নারী জাতিকে নব জাগরণে উদ্বুদ্ধ করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশো ভল্টেয়ারের লেখার মাধ্যমে ধৃনিত হয়েছে তদানীন্ত্মন বিক্ষুব্ধ ফরাসী জনগণের অসন্ত্মোষ ও তীব্র অভিযোগ। স্বৈরাচারী ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজে সেদিন এই দু'চিন্ত্মাবিদের অভয়ধৃণী তাঁদের সূচীন্ত্মা প্রসূত কার্যধারা সারা ফরাসী সমাজের মধ্যে এনে দেয় সাহিত্য মানুষের চিরন্ত্মন সাথী।

অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় আদিবাসীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার নবদিপন সূচনা করেন তৎকালিন সময়ের গুটিকয়েক সাহিত্য প্রেমিক। এক্ষেত্রে রাজমাতা বিনীতা রায় অধুলানুপ্ত " গৈরিকা" সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য চর্চায়

ও সাংবাদিকতায় ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছেন। তাছাড়াও কবি সলিল রায়, ভারতের আনন্দ বাজার পত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম সাংবাদিক অধ্যাপক কোকনদাক্ষ রায় ,কবি অরুন রায়ের "ঝরাপাতা" আদিবাসীদের সাহিত্য-চর্চা জাতি গঠনের চেতনা যোগায়। পরবর্তী আশির দশকে আদিবাসীদের মধ্যে আর্বিভূত হন আরো কয়েকজন প্রতিভাবান সাহিত্য ,ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক গবেষক। তাঁরা হলেন -দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা, সুগত চাকমা (ননাধন), সুপ্রিয় তালুকদার, সুহৃদ চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা, শিশির চাকমা, ঝিমিত ঝিমিত চাকমা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী বীর কুমার তংঞ্চঙ্গ্যা, রতিকান্ত তংঞ্চঙ্গ্যা, স্বর্গীয় অশোক কুমার দেওয়ান, স্বর্গীয় সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। কবি তরুন কুমার চাকমা এবং কবি শ্যামল তালুকদার উল্লেখযোগ্য। আরো গর্বের ও সুখের বিষয় যে সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও রাষ্টদৃত শ্রী শরদিন্দু শেখর চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাক-ভারত বিষয়ে তথ্য বহুল বিভিন্ন অমূল্য বই লিখে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে নব চেতনায় শানিত করে যাচ্ছেন। তাঁদের ক্ষুরধার লেখনি, চিন্ত্মা চেতনা আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে গতিশীল এবং সুসমৃদ্ধ করেছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জাতীয় জীবনে সাহিত্য সংস্কৃতি এবং নান্দনিক শিল্পকলা বিপ্লবের নব যুগের সুচিত হয়েছে। চলমান জাতীয় স্রোতধারায় আদিবাসী সংস্কৃতি ও স্বজাতীয় সাহিত্যর্চচা আন্দোলন - যুক্ত হয়ে অপসংস্কৃতি রোধে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ফিরে এসেছে সাংস্কৃতিক জোয়ার ও নব প্রেরণার স্পন্দন। আদিবাসীরা বর্তমানে নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে কতটুকু সচেতন তার পরিচয় পাওয়া যায় কতগুলো প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নামকরণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। যেমন শিল্পক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান-বেইন টেক্সটাইল, সজপদর, হোটেল সাবারাং, মৌনতলা, চিৎজুরানী, দোলবি শপিং সেন্টার, ধনপুদি, রাধামন গেঙ্খুলি শিল্পী গোষ্ঠী, টংগ্যা, ভালেদী সমিতি, তারুম সংস্থা, তৈমুর, জাবারাং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নামকরণের দিক ক্ষেত্রে এক একটি সাংস্কৃতিক-চেতনারই বর্হিপ্রকাশ। আর তা সম্ভব হয়েছ আদিবাসী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বিপ্লবী প্রতিভাবান সৃজনশীল লেখক ও সাহিত্যকদেরই নিরলস সংগ্রামের মাধ্যমে। আদিবাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় যে নব ধারার সূচীত হয়েছে তা ধরে রাখতে হবে। সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীরাও মানুষ আর মানুষ মাত্রই মরণশীল। সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীরা ও একদিন প্রস্থান করবে-জীবন ও জগতের স্বপ্নের দ্বীপ থেকে। কিন্তু সেই সাহিত্য বেঁচে থাকবে সাহিত্যিকদের মাধ্যমে আর-সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি বিপ্লবীরা অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাকবেন জাতীয় ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে।

.....

* প্রগতি খীসা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী কবি পরিষদ এবং সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, রাঙামাটি জেলা শাখা।

ড. অমর কান্তি চাক্‌মা

মাতা পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাতা পিতার মত পৃথিবীতে অতি আপন জন কেউ নেই। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে মাতা পিতাকে ব্রহ্মসদৃশ ও আদিগুরু বলা হয়। মা সন্তানকে দশমাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে গভীর স্নেহে নিজের রক্তকে দুগ্ধে পরিণত করে সন্তানদের বড় করেন। আর পিতা সন্তানকে স্নেহ চুম্বন ও আলিঙ্গন দিয়ে প্রতিপালন করে থাকেন। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এ চতুর্বিধ গুণকে ব্রহ্মবিহার বলা হয়। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা সন্তান সন্ততিদের প্রতি মাতা পিতার অন্তরে সদা সর্বদা বিরাজমান থাকে। এ কারণে মাতা পিতাকে ব্রহ্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মাতা পিতার কাছ থেকেই একজন মানব শিশু প্রথমে বুলি শিক্ষা গ্রহণ করে। এজন্য মাতা পিতাকে আদিগুরু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাঁচটি কারণে সন্তান সন্ততিগণের কাছে মাতা পিতা মহান উপকারী যেমন- ১. সন্তানদেরকে পাপ কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে; ২. সর্বদায় কল্যাণ কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করে; ৩. যথা সময়ে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করে; ৪. উপযুক্ত সময়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে এবং ৫. যোগ্যতা বিবেচনা পূর্বক সময় মত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে।

মাতা পিতার গুণ অনন্ত ও অপরিসীম। অসীম আকাশের যেমন সীমানা নির্ধারণ করা যায় না, তেমনি মাতা পিতার গুণও অতুলনীয়। এরূপ অনন্ত গুণসম্পন্ন মাতা পিতার প্রতি সন্তানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ? সিঙ্গালোবাদ সূত্রের উপদেশ অনুসারে সন্তান সন্ততিগণ মাতা পিতার প্রতি পাঁচটি কর্তব্য সম্পাদন করবে যেমন- ১.তাঁদের ভরণপোষণ; ২. তাঁদের কাজ সম্পাদন; ৩. বংশ মর্যাদা রক্ষা; ৪.তাঁদের উপদেশ অনুসারে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং ৫. প্রয়াত মাতা পিতার সদ্গতির জন্য পুণ্যানুষ্ঠান করা। এছাড়াও মাতা পিতার প্রতি অত্যধিক সম্মান, গৌরব ও ভক্তি প্রদর্শন করা; তাঁদের আদেশ উপদেশ প্রতিপালন করা; মাতা পিতা যেদিকে অবস্থান করেন সেদিকে পাদ প্রসারণ না করা; প্রবাসে যাওয়ার সময় এবং প্রবাস থেকে ফিরে এসে মাতা পিতাকে ভক্তি সহকারে অভিবাদন করা; তাঁদের সম্মুখে রাগান্বিত হয়ে কোন প্রকার অশোভনীয় কথা না বলা; মাতা পিতার উপস্থিতিতে কোন উচ্চাসনে উপবেশন না করা এবং তাঁদেরকে সর্বদা কুশল কর্মে নিয়োজিত করাই হলো প্রতিটি ছেলেমেয়ের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে- কেউ যদি মাতা পিতাকে দুই স্কন্ধে ধারণ করে নিরন্তর সেবা শুশ্রূষায় নিয়োজিত থেকে শত বছর ব্যাপী সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করান তারপরেও মহান উপকারী, অনন্ত গুণসম্পন্ন পিতা মাতার ঋণ শোধ করা যায় না। তবে একটি মাত্র উপায়ে মাতা পিতার ঋণ শোধ করা যায়, তা হলো- কোন মিথ্যাদৃষ্টি অথবা অশ্রদ্ধা সম্পন্ন

মাতা পিতাকে যদি সন্তানেরা সম্যকদৃষ্টি ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন করাতে পারেন তখনই মাতা পিতার ঋণ পরিশোধ হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বোধিজ্ঞান লাভের পঞ্চম বছরে মহামানব গৌতম বুদ্ধ যখন কোসাম্বীতে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি সংবাদ পান রাজা শুদ্ধোদন মৃত্যুর শয্যায়। কয়েকজন শিষ্যসহ তিনি সহসা কপিলাবস্তু রওনা হন। বৈশালী ও শ্রাবস্তী হয়ে দ্রুত কপিলাবস্তু পৌঁছেন এবং রুগ্ন পিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। বুদ্ধের সেবায় ও ধর্মকথায় রাজা উদ্বুদ্ধ হন এবং মৃত্যুর আগে অর্হত্বফল লাভ করেন। বুদ্ধের উপস্থিতিতে রাজা শুদ্ধোদন নির্বাণ লাভ করেন। তিনি স্বয়ং পিতার অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

অতঃপর বুদ্ধ তাঁর প্রয়াত মাতা মহামায়া দেবীকে (বর্তমানে দেবপুত্র) ধর্মোপদেশ দেওয়ার জন্য তাবত্রিংশ দেবলোকে গমন করেন। সেখানে তিনি সপ্তম বর্ষাবাস যাপন করেন। প্রতিদিন মাকে তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন। ত্রিপিটকের অভিধর্ম নাকি এখানেই বর্ণিত হয়েছিল। দিনের বেলা আহারের সময় হলে তিনি সেখান থেকে হিমালয়ের পাশে কুরু প্রদেশে গিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে ভোজন করতেন এবং অনবতপ্ত হ্রদের পাশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে প্রয়াত মায়ের কাছে চলে যেতেন। এভাবে তিনমাস মাকে ধর্মীয় উচ্চমার্গে উন্নীত করে সাংকাশ্য নগরে দেবলোক থেকে অবতরণ করেছিলেন বলে বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

বুদ্ধ কপিলাবস্তু ও দেবলোকে গমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাতা পিতার ঋণ শোধ করা। তিনি তাঁর মাতা ও পিতাকে ধর্মীয় উচ্চতর জ্ঞানে উন্নীত করে মাতা পিতার ঋণ পরিশোধ করেন। আমার এ নিবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিদগ্ধম-লীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি-*" ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন লোক মৃত্যুবরণ করলে সেই প্রয়াত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া অনুষ্ঠানে পবিত্র ভিক্ষু সংঘের একাংশ অংশ গ্রহণ করেন না, তাঁদের মতে অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া অনুষ্ঠানে নাকি কোন ভিক্ষু সংঘের প্রয়োজন হয় না। তাই যদি হয় এখানে প্রশ্ন হলো, বৌদ্ধশাস্ত্রের বর্ণনানুসারে স্বয়ং বুদ্ধ যদি তাঁর পিতার অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন, তাহলে বুদ্ধপুত্র হয়েও উক্ত ভিক্ষুসংঘ অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আপত্তি কেন ? আমার মত অর্বাচীন লোকের তা একেবারেই বোধগম্য নয়। আবহমান কাল ধরে প্রচলিত রীতি-নীতি সমূহ নিজের মত করে মনগড়া অপব্যাখ্যা দিয়ে একদিকে যেমন বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে বিকৃত করা হচ্ছে অপরদিকে কোন কোন অঞ্চলে তা নিয়ে বিভেদও সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে আমরা শুধু ধর্মীয়ভাবে নয়, কি সামাজিকভাবে, কি রাজনৈতিকভাবে দ্বিধা, ত্রিধা ও বহুধাবিভক্ত হতে হতে এর পরিণতি যে কোথায় গিয়ে ঠেকে একমাত্র মহাকালই বলে দিতে পারবে।*

এখন এখান থেকে উত্তরণের উপায় কী ? বিজ্ঞ,বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সম্পন্ন সুধী পাঠকমহলের উপর ছেড়ে দিলাম।"

যাক এক্ষণে মূল বিষয়বস্তুতে ফিরে যাচ্ছি, আজকাল সন্তান সন্ততিগণ মাতা পিতার প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু প্রতিপালন করে থাকে তা কিঞ্চিত আলোচনা করে আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি ইতি টানবো। পূর্বেই উল্লেখ করেছি করুণাঘন বুদ্ধ দেশিত সিঙ্গালোবাদ সূত্রের উপদেশ অনুসারে সন্তান সন্ততিগণ মাতা পিতার প্রতি কিভাবে কর্তব্য সম্পাদন করবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কয়জন সন্তানই বা মাতা পিতার প্রতি তাদের এ নৈতিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন? এটা অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, বর্তমান সমাজে এমন কিছু অনভিপ্রেত চিত্র ফুটে উঠে যা একেবারেই কাম্য নয়। যেমন বহু বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্থ মাতা পিতা অনাদরে, অবহেলিত ও অসহায়ভাবে জীবন যাপন করছেন। আবার অনেক মাতা পিতার এ করুণ অবস্থাতেই জীবন প্রদীপও নির্বাপিত হয়েছে। যে সময়টুকু সন্তানের কাছে মাতা পিতা সবচেয়ে বেশী ভরণপোষণ, সেবা শুশ্রূষা কামনা করে, সে সময়ে তাঁরা আজ উপেক্ষিত ও অবহেলিত। সম্প্রতি পত্রিকার মারফতে এমনও খবর প্রকাশিত হচ্ছে, কোন কোন অঞ্চলে নিজের ছেলেমেয়ের কাছে মা বাবা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও লাঞ্চিত হচ্ছেন আর কেউ কেউ জীবন পর্যন্ত হারিয়েছেন। এর চেয়ে সমাজের অবক্ষয় আর কতটুকু হতে পারে!!

আসলে বর্তমান ছেলেমেয়েদের এত নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ কী? আমি মনে করি এ নৈতিক অবক্ষয়ের পিছনে অন্যতম কারণ হলো ছেলেমেয়েদের মানবীয় গুণাবলী তথা সুশিক্ষার অভাব। আজকাল মাতা পিতারা তাঁদের সন্তান সন্ততিদেরকে যেভাবে সাধারণ শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যায় শিক্ষিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে উঠে পড়ে লেগে থাকেন, সেভাবে কিন্তু সুশিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য তেমন একটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। এ সুশিক্ষার অভাবে কোন কোন ছেলেমেয়ের মানবিক মূল্যবোধ তো দূরের কথা ন্যূনতম কান্ডজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। যার কান্ডজ্ঞানের অভাব সে কীভাবে এত বড় মহান উপকারী মাতা পিতাকে মূল্যায়ন করবে ?

প্রত্যেক মা-বাবা সৎ ,যোগ্য ও উচ্চ শিক্ষিত সন্তান কামনা করে। তাঁরা আরো কামনা করেন সন্তান সন্ততিগণ শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হয়ে চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বানিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের ভরণপোষণ করবে এবং বংশ মর্যাদা রক্ষা করবে। এ সুপ্ত বাসনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মাতা পিতারা বহু আশা ভরসা নিয়ে যার যেরকম সামর্থ্য অনুসারে তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। যেখানে শিক্ষার্থীদের বই-খাতা-কলম নিত্য সঙ্গী হওয়ার কথা, সেখানে কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থী সুশিক্ষার অভাব ও কুশিক্ষার প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয় এবং জুয়াখেলায় মত্ত থাকে। এভাবে অকালেই ঝড়ে পড়ছে অনেক শিক্ষার্থী । চুরমার হয়ে

যাচ্ছে হাজারো মাতা পিতার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন। আর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন তারাও অনেকেই মা-বাবার কথা বেমালুম ভুলে যায়। বহু উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজন এমনকি নিজের ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে চলে গেছেন এবং কেউ কেউ চলে যাওয়ার পথে। আর উচ্চ শিক্ষিত ছেলেরা? এদের মধ্যে অনেকেই সংসার জীবনে আবদ্ধ হওয়ার পর শুধু নিজের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তখন তাদের মা বাবার কথা খেয়ালই থাকে না। তারা কীভাবে মাতা পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করবে?

আবার সমাজে এমন কিছু দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ন ছেলেমেয়ে দেখা যায়, যারা ভগবানের পরের আসনে মাতা পিতাকে অধিষ্ঠিত করে সেবা যত্ন করে পরম আনন্দ লাভ করেন। এঁরা কিন্তু সংখ্যায় অতি নগন্য। একমাত্র ধার্মিক ও পুণ্যবান মাতা পিতারা এ ধরণের সুসন্তান লাভ করে থাকেন। এ কারণে প্রত্যেক মাতা পিতার ধর্মীয় জ্ঞানে বা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত। সুশিক্ষিত মাতা পিতা না হলে সৎ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে না। সৎ সন্তান না হলে মা-বাবারা প্রতি পদে পদে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হবেন। তবে প্রত্যেক মাতা পিতা তাঁর সন্তান সন্ততিকে সুশিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা নাও থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে সন্তান সন্ততিগণ নিজের প্রয়োজন বোধ মনে করে মাতা পিতার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন করা উচিত। কারণ যে মাতা পিতাকে অবহেলা করবে তাকেও একদিন একই পরিণতি ভোগ করতে হবে নিঃসন্দেহে।

প্রত্যেক মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অতৃপ্ত ভোগ বিলাসী জীবন যাপনের তাগিদে অর্থ-বিত্ত,গাড়ি-বাড়ি করার জন্য যারা সুশিক্ষাকে বাদ দিয়ে শুধু সাধারণ শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যার পেছনে লাগামহীনভাবে ছুটেন তারা কোন দিনই মানসিকভাবে শান্তি লাভ করতে পারে না। কারণ অন্তর্জগতে মানবীয় গুণাবলীতে সমৃদ্ধ না হলে, বৈষয়িক সম্পদে মানুষ প্রকৃত সুখী হতে পারে না। এজন্যে সুখী ও সৌষ্ঠব জীবন গঠনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সন্তান সন্ততিগণকে ধর্মীয় শিক্ষা বা সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা অপরিহার্য। সুশিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সমাজ ও জাতির গর্ব। সুশিক্ষিত সন্তানেরা মাতা পিতার প্রতি প্রাগুক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হন। এ সুশিক্ষিত সন্তান সন্ততিগণের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও অকৃত্রিম সেবা যত্ন লাভ করে মাতা পিতারা পরম সুখী হন। যে সন্তান মাতা পিতাকে আনন্দ দিতে পারে তার জীবন ধন্য হয়।

.....

* ড. অমর কান্তি চাকমা, প্রভাষক কাম কো-অর্ডিনেটর, বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট কলেজ, ঢাকা।

অম্লান চাকমা

আমাদের আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা

নতুন সহস্রাব্দে পার্বত্য জনপদের বাসিন্দারা পার করলো এক যুগের বেশি সময়। এক জীবনে দুই শতাব্দীকে পাওয়া আদিবাসী তরুণ প্রজন্মের জন্য বিরল সৌভাগ্য। যে শতাব্দীকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি সেটি ছিলো মননশীলতায়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে, আর সর্বোপরি জীবন-প্রণালীর উৎকর্ষতায় এক স্বর্ণালী অধ্যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের জীবন কেটেছে আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির নানান দোলাচলে। ষাটের দশকে কাপ্তাই বাঁধের কারণে বাস্তুহারা হয়েছে লাখো মানুষ। এরপর আদিবাসীরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিলে জ্বলেছে অশান্তিঅর দাবানল। দুই দশকের অধিক কাল পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্তিঅর আগুনে তাতিয়ে ১৯৯৭ সালে এসে স্বাক্ষরিত হয় *'ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'*। অসম এক সশস্ত্র যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির ফলে অত্রাঞ্চলে শান্তিঅ প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। যার কারণে *'শান্তিঅ চুক্তি'* নামেই এর অধিক পরিচিতি। কিন্তু বাস্তবায়নাধীন এই চুক্তির বর্তমান হালচাল নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষের কাছ থেকে এখনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য শোনা যায়। তবে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধীর গতি নিয়ে অবশ্যই সাধারণ জনগণের অনেক প্রশ্ন আছে। ভুক্তভোগীদের মাঝে যা জন্ম দিচ্ছে বহুমাত্রিক হতাশার।

তবে একথা মানতে হবে, চুক্তিত্তোর পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের সার্বিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির যে চিত্র তা রীতিমত চোখ ধাঁধানো। আদিবাসীদের বৈচিত্রময় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, বস্তুগত সংস্কৃতি, শিল্প, ক্রীড়া, গণ মাধ্যমে সম্পৃক্ততা, উন্নয়ন অন্বেষণ, আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নারীর অংশ্রগ্রহণ প্রভৃত ক্ষেত্রে ঘটেছে ব্যাপক প্রসার। এই নিবন্ধে হয়তো এসব অর্জনের বিস্তারিত পর্যালোচনা সম্ভব হবেনা। তারপরও সাম্প্রতিক সময়ে আদিবাসী তরুণ তরুণীদের কিছু কিছু অভিনব অর্জনকে আলোকিত রেখে এই আলোচনাকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ে যেতে আগ্রহ বোধ করছি। একথা শুরুতেই বলে নেয়া প্রয়োজন, সংখ্যাধিক্য, ঐতিহাসিক বাস্তবতা আর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামগ্রিক অবদানের কারণে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য আদিবাসীদের তুলনায় বেশ এগিয়ে।

শুরু করতে চাই আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের গণ মাধ্যমে সরব উপস্থিতির সংবাদ জানিয়ে। পত্রিকায় লেখালেখি কিংবা সাংবাদিকতা করে জীবন ধারণ করা যায় - এমন বিশ্বাস এক দশক আগেও আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ছিলনা। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে কন্টকার্কীর্ণ সেই পথে সর্বাগ্রে পা বাড়ালেন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়া রাঙামাটি শহরের

রাঙাপানি গ্রামের এক দুঃসাহসী তরুণ। সেই হরি কিশোর চাকমা এখন *প্রথম আলোর* রাঙামাটি জেলার স্টাফ রিপোর্টার। তার দেখানো পথে নিশ্চিন্তঅ বিচরণ এখন বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, সত্রং চাকমা, সৈকত দেওয়ান, ইলিরা দেওয়ান, চিং মে, উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা, হিমেল চাকমাদের।

ইংরেজী পত্রিকায়ও আছেন শান্তিঅময় চাকমা, ঝন্টু চাকমা, জাগরণ চাকমা আর মুক্তাশ্রী চাকমা সাথীর মত সম্ভাবনাময়ী আরো কেউ কেউ। *ইনডিপেনডেন্ট* এর তরুণ স্টাফ রিপোর্টার খাগড়াছড়ির জাগরণ চাকমা তার বিশ্লেষণধর্মী লেখাগুলোতে মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসেছেন তিনি। বাংলাদেশের আদিবাসী নারীদের মধ্যে ২০১০ সাল থেকে সর্ব প্রথম ইংরেজী দৈনিকে যোগ দেন রাঙামাটির মুক্তাশ্রী চাকমা সাথী। *ঢাকা ট্রিবিউন* এর একজন স্টাফ রিপোর্টার তিনি। ইতিমধ্যে শিশু অধিকার নিয়ে তার সৃজনশীল প্রতিবেদন এর জন্য পেয়েছেন UNICEF পুরস্কার। লেখালেখির বাইরেও অন্যান্য শাখাতে সমান পারদর্শী তিনি। ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের প্রথম এবং এখনো পর্যন্তঅ সর্বশেষ নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে এক সরকারী সফরে মালদ্বীপে গেছেন ২০০৯ সালে। সম্প্রতি সুইডিস্ট ইনষ্টিটিউট কর্তৃক বাংলাদেশের তরুণ নেতৃত্বের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে ঘুরে এসেছেন সুইডেন।

ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও কয়েক বছর আগে অভিগমন ঘটেছে আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের। সংবাদ পাঠিকার ভূমিকায় রাঙামাটির ঐশ্বর্য খীসা, ফ্রিজিয়া তালুকদার এখন অনেক পরিপক্ক। সংবাদ পাঠক, উপস্থাপক খাগড়াছড়ির রক্তিম ত্রিপুরা দাঁড়িয়ে গেছেন শক্ত ভীতের উপর। বান্দরবানের মেয়ে চিং এশা এখন অনেক আদিবাসী তরুণীর আইডল।

ফটোগ্রাফির দিকেও ইদানিং ঝুঁকছেন উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক তরুণ-তরুণী। সুপ্রিয় চাকমা দেখিয়ে দিয়েছেন এটিকে কেবল শখ নয়; পেশা হিসাবেও নেয়া যায়। অমিয় কান্তিঅ চাকমা, নির্মল কান্তিঅ চাকমা, শুভাশীষ চাকমা, ছন্দসেন চাকমা আর তনয় দেওয়ান এর ছবি এখন নিয়মিত স্থান পায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দিনপঞ্জিকায়। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন জুয়েল চাকমা পরান, তনেশ চাকমা, সান্ত ত্রিপুরারা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আছে বহু মাত্রিক অর্জন। এ পর্যন্তঅ অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন শতাধিক আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী। তবে *মুক্তিযুদ্ধ* পরবর্তী আদিবাসী তরুণ প্রজন্মের সাফল্যের গল্প লিখতে গেলে সবার আগে আসবে যার নাম তিনি মালছড়ির সিঙ্গীনালা গ্রামের তুখোর মেধাবী মংসানু মারমা। আমেরিকায় বাংলাদেশের সফল বিজ্ঞানীদের তিনি একজন। এইচএসসি এবং এইচএসসিতে যথাক্রমে সিঙ্গিনালা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে। উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগ। সবুজ পাহাড়ে বেড়ে উঠা মংসানুর এরপর *রসায়ন* পড়তে

আগমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনার্সের ফলাফলে হয়েছেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। মাস্টার্সে *জৈব রসায়নে সর্বোচ্চ* নম্বর পেয়ে জিতে নেন ড. *মালেকা আল রাজী স্বর্ণ পদক*। অতপরঃ স্কলারশীপ নিয়ে তার জাপান যাত্রা Marine Chemistry অধ্যয়নের জন্য। সেখানকার University of the Ryukyus থেকে ১৯৯৯ সালে অর্জন করেন দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রী। সেখান থেকে পাড়ি দেন যুক্তরাষ্টের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লসএঞ্জেলসে। সেখানে University of the Southern California থেকে *জৈব রাসায়নে* তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন ২০০৫ সালে। এখানেই থেমে থাকেন নি তিনি। পরের দু'বছর নিউইয়র্কে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত Columbia University তে Genome Centre এ কাজ করেন Post-doctoral Scientist এর ন্যায় সম্মানজনক পদে। বিষয় Chemical Genomics। বর্তমানে আছেন জার্মান ভিত্তিক অন্যতম জৈব প্রযুক্তি ফার্ম Qiagen কর্পোরেশন- আমেরিকা বোস্টন শহরের ল্যাবরেটরিতে। এখানে জিনের অনুক্রম (DNA Sequence) পদ্ধতি র্নিধারণের নতুন প্রজন্মের উদ্ভাবনের জন্য কাজ করেন। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে - বংশ গতির বাহক DNA নিয়ে গবেষণার জন্য অত্যাবশ্যকীয় নতুন রাসায়নিক পদার্থ তিনি নিজেই তৈরি করেছেন। আর একজন রসায়নবীদ হিসাবে এটিই তার বিশেষত্ব। মৎসানু মারমা ও তার সহযোগী গবেষকদের উদ্ভাবিত DNA অনুক্রম নির্ধারণের পদ্ধতি Qiagen কর্পোরেশন বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগে ক্যান্সারসহ নানান জটিল বংশগতি রোগের সহজ ও নির্ভরযোগ্য ডায়াগনোসিস ও পূবানুভব করা সম্ভব হতে পারে। Massachusettes অঙ্গরাজ্যের Boston শহরে অবস্থিত এই ল্যাবরেটরিতে তিনি ২০০৭ সালে যোগ দেন একজন বিজ্ঞানী হিসাবে। দুই বছর পর পদোন্নতি পেয়ে হন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী । তিনি এখন জৈব রসায়ন বিভাগের পরিচালক। তার অধীনেই এখন পিএইডি ডিগ্রীধারী কতিপয় গবেষক কাজ করেন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে ছাপা হয়েছে তার লেখা ১৫টির মত গবেষণা প্রবন্ধ। এসব প্রবন্ধে তার গবেষণার বিভিন্ন দিক যেমন নতুন জৈব যৌগের সংশ্লেষণ (Organic Synthesis), নতুন ঔষধ আবিস্কার ও তৈরি (New Drug Design and Synthesis), রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সরাসরি পর্যবেক্ষণ (Real Time Bio-sensor), ও নতুন প্রজন্ম জিন অনুক্রম পদ্ধতি (Next Generation DNA Sequencing Method) স্থান পেয়েছে। নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ এর প্রিয় ছাত্র তিনি- একথা তার সহপাঠিরা সকলেই জানেন। হুমায়ূন আহমেদও কোন এক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে সেসময় তার প্রিয় ছাত্রের নাম বলতে গিয়ে এই মং এর কথাই লিখেছিলেন।

বিভিন্ন সূত্রমতে বান্দরবানের ক্ষুদ্র আদিবাসী *খুমী'*দের জনসংখ্যা আনুমানিক ২৬০০। তাদেরই একজন লেলুং খুমী। তিনি ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্টের Dortmutt College এবং পরে ২০১০ সালে অষ্টেলিয়ার Southern Cross University, Lismore, New South Wales থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা তিনিই খুমীদের মধ্যে

প্রথম গ্রাজুয়েট। বর্তমানে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে সুনামের সাথে Planning Officer এর দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপশি একজন ত্যাগী স্বেচ্ছাসেবীর ব্রত নিয়ে তার সম্প্রদায়ের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য কাজ করছেন নিরন্তর। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বাংলাদেশ এর জাতীয় সমন্বয়ক খাগড়াছড়ির আরেক কৃতি সন্তান অভিলাষ ত্রিপুরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে তিনিও অষ্ট্রেলিয়া থেকে নিয়েছেন উচ্চতর ডিগ্রী।

পাহাড়ের সংখ্যালঘু একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠি *চাক*। তাদের মূল নিবাস বান্দরবানের বাইশারী মৌজায়। উছা ছা-এ চাক এই জনগোষ্ঠির প্রথম উচ্চশিক্ষিত নারী। তিনিই প্রথম পা রাখেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার জীবনটাই সংগ্রাম মুখর। চার বোনের মাঝে সে সবার বড়। বাবা চা চক্রা অং চাক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের এ্যম্বুলেন্স চালক। টানাটানির সংসারে বাড়তি কিছু আয়ের জন্য তাই উদ্যোগী হন তার মা। কোমর তাঁতে কাপড় বুনে বিক্রি শুরু করেন। এভাবে খুলে বসেন ছোট্ট মুদির দোকান। এক সময় আগুনে পুড়ে ছাই হয় সেই দোকান ও। বাবার বদলীর কারণে তারা চলে যান কক্সবাজার। সেই কলেজ জীবন থেকে পড়াশুনার আংশিক খরচ যোগাতে শুরু করেন টিউশনি। সহপাঠীদের সব কটাক্ষ এসময় মুখ বুঁজে সহ্য করেছেন। কক্সবাজার মহিলা কলেজ থেকে ২০০১ সালে এইচএসসি পাশ করে ইংরেজী সাহিত্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। একজন নারী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা নিয়ে এ সময় তার সমাজে শুরু হয় কানাঘুষা। এতে তার মা-বাবাও কিছুটা মুষড়ে পড়েন। এক সময় তারা সামলে নেন। তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় তিনি Ausaid বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হন। অর্জন করেন University of Adelaide থেকে Development Studies এ স্নাতক ডিগ্রী। অষ্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে একজন Research Fellow হয়ে কাজ করেছেনI CDDRB তে। বছর হতে চলেছে National Consulatnt হিসাবে যোগ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায়। স্বজাতির তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষায় উৎসাহিত করতে কাজ করে যেতে চান তিনি।

চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় একটি প্রশ্নে সবাইকে ভিরমি খেতে হয়। প্রশ্নটি অনেকটা এরকম-বাংলাদেশের পাংখো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম স্নাতক ডিগ্রী কে লাভ করেছেন? সঠিক উত্তরটি জানাতে বলি-তার নাম লাল ছোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া। বিলাইছড়ির প্রত্যন্ত মালুম্যা পাংখো পাড়ার তথা পাংখোদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্নাতক ডিগ্রীধারী। উন্নয়ন কর্মীর পরিচয়ে তার ক্যারিয়ার শুরু করেন রাঙামাটির সবচেয়ে বড় এনজিও *গ্রীন হিলে*। সেখানে প্রকল্প সমন্বয়কারী হিসাবে লাল ছোয়াক কাজ করছেন বিগত ১২ বছর ধরে। চাকুরীর সূত্রে একাধিকবার গিয়েছেন ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মালেয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আর দক্ষিণ আফ্রিকা। গিটার বাজিয়ে চমৎকার গান গাইতে পারেন তিনি। আমুদে এই মানুষটি নিজে গান লিখে আর সুর দিয়ে গেয়ে শোনান সহকর্মী আর বন্ধুদের।

রাঙামাটি জেলার খেদারমারা ইউনিয়নের কাঞ্চন চাকমা, ২০১১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biological Sciences যোগ দিয়েছেন প্রভাষক হিসাবে। স্নাতক এবং সম্মান পরীক্ষায় তার স্থান যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ এবং তৃতীয়। সহকারী অধ্যাপক হয়ে তিনি বর্তমানে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে আনন্দ বিকাশ চাকমা প্রভাষক হয়ে যোগ দিয়েছেন বছর তিনেক আগে।

জাতিগত সংঘাতের নির্মম শিকার অনুরাগ চাকমার শৈশব কেটেছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের এক শরণার্থী শিবিরে। দেশে ফিরে তার স্কুল আর কলেজ জীবন কেটেছে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে *শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন* বিভাগে তিনি হয়েছেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। প্রভাষক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন মার্চ ২০১৩ সাল থেকে। পার্বত্য চট্টলার আরেক কুরুক্ষেত্র লংগদুর দুর্গম বগাচদর ইউনিয়ন থেকে সাফল্যের চূড়ায় উঠা আসা এক সংগ্রামী যুবকের নাম বসুমিত্র চাকমা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম তিনিও। প্রভাষক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেছেন এখনো বছর হয়নি। লেখাপড়ার পাশাপাশি নান্দনিক ক্রিয়াকলাপ আর সমসাময়িক ছাত্র রাজনীতিতেও ছিল তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। শিক্ষক হয়েই থাকতে চান আজীবন। নিতে চান উচ্চতর ডিগ্রী। সেই সাথে তার জন্মস্থান আর পার্বত্যবাসীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে চান।

কঠোর জীবন সংগ্রাম আর সফলতার মূর্ত প্রতীক খাগড়াছড়ির মাটিরাঙার রাজীব ত্রিপুরা। পরিবারের সদস্যরা তার জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় খরচ যোগাতে তিনি কাজ করেছেন বিভিন্ন পত্রিকায়। আর বর্তমানে তিনি বিসিএস, পররাষ্ট্র পরিবারের একজন গর্বিত সদস্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আরেকটি ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠি *তঞ্চঙ্গ্যা*। এই জনগোষ্ঠির জন্য নতুন এক ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন রুমি তঞ্চঙ্গ্যা। প্রায় দেড় দশক পর তার জনগোষ্ঠির প্রথম আর আদিবাসীদের মধ্যে দ্বিতীয় নারী হিসাবে ২৭তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যোগ দিয়েছেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে। ছিলেন ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেটের ছাত্রী। সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাঙামাটির স্থানীয় কয়েকটি উন্নয়ন সংস্থায় গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন এই চাকুরীতে যাবার আগে। সম্প্রতি Ausaid বৃত্তি নিয়ে দু'বছরের জন্য পড়তে গেছেন অষ্ট্রেলিয়ায়।

বাংলাদেশের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য ক'বছর আগে একটি বড় ধরনের চমক ছিল। টিভির সংবাদে দেখানো হচ্ছে- আদিবাসী এক নারী রাজধানীর বুকে ভেজাল বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আর কোন সময় প্রিন্ট আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মুখোমুখি হয়ে মিডিয়া

কর্মীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন বিশুদ্ধ বাংলায়! তিনি বিসিএস এডমিন ক্যাডারের সদস্য রণি চাকমা। রাঙামাটি শহরের প্রাণকেন্দ্র বনরূপার সেই মেয়েটি অনেক তরুণ তরুণীর কাছে এখন অনুপ্রেরণার উৎস। অপরদিকে প্রথম আদিবাসী নারী হিসাবে ৩১তম বিসিএসে ১৫ তম স্থান লাভ করে পররাষ্ট্র ক্যাডারে দুর্দান্ত অভিষেক ঘটিয়েছেন তুষিতা চাকমা। তার এই অভূতপূর্ব সাফল্যে গর্বিত সব পার্বত্যবাসী ।

বিগত সময়ে পুলিশ প্রশাসনে নিয়োগপ্রাপ্ত বিধান ত্রিপুরা, সুজ্ঞান চাকমা, অনির্বাণ চাকমা, নিকুলিন চাকমা, মিশুক চাকমা, দীপক জ্যোতি খীসা, নিস্কৃতি চাকমা, সত্রধর ত্রিপুরারা যোগ্যতা আর দক্ষতায় প্রমাণ দিচ্ছেন তাদের সহকর্মীদের সাথে। নিস্কৃতি চাকমার কথাও আলাদা ভাবে বলতে হবে। কারণ ২৭তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে সহকারী পুলিশ সুপার হিসাবে যোগ দেয়া তিনি দেশের প্রথম আদিবাসী নারী। বর্তমানে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার হিসাবে দায়িত্বে আছেন ফেণীতে।

ছোট্ট এক কিশোরের অভিনব সাফল্য গাঁথা না লিখলে এ লেখা পূর্ণতা পাবেনা। ২০০৭ সালে পাহাড় ঘেরা উপজেলা বরকলে রিবেং দেওয়ান তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। *জাতি সংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম* সংস্থার *লোগো*'র জন্য বিশ্বব্যাপী এক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। ১২ বছরের এক অখ্যাত বালক সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে জিতে নেয় প্রথম স্থান। তার অংকিত চিত্রকর্মটি জাতি সংঘের এই বিশেষায়িত সংস্থাটির *লোগো* হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ফোরামের চেয়ারপার্সন ফিলিপাইনের Victoria Touli – Coropus মে, ২০০৭ সালে তাকে পুরস্কৃত করেন। রিবেং দেওয়ান নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠির মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ট হল লুসাই। মূলত রাঙামাটি পার্বত্য জেলা সদর ও বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক উপত্যকায় এবং বান্দরবান জেলা সদর ও রুমায় লুসাইদের বাস। লিনা জেসমিন লুসাই তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন অন্যতম আলোচিত এক নাম। বান্দরবানে বেড়ে উঠা এই নারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েছেন *লোক প্রশাসনে*। অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৯ সালে Development Studies নিয়ে অর্জন করেছেন স্নাতক ডিগ্রী। Oxfam GB তে এরপর কিছুদিন কাজ করেছেন সমতলের আদিবাসীদের নিয়ে। এরপর থেকে কাজ করছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হয়ে সারা দেশের আদিবাসীদের নিয়ে। বর্তমানে তিনি কেবল একজন আদিবাসী নারী হিসাবেই নন; একজন নারী অধিকার এবং মানবাধিকার কর্মী হিসাবে সংশ্লিষ্টদের কাছে পরিচিত। দেশে বিদেশে প্রায়ই তিনি বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিয়ে থাকেন। সেসব ফোরামে বক্তব্য রাখেন আর সাক্ষাৎকার দেন আদিবাসীদের বঞ্চনার ইতিহাস নিয়ে। ইতিমধ্যে সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়াসহ ঘুরেছেন আরো কিছু দেশ।

একটি সামষ্টিক অর্জনের কথা আলোচনায় আনতে চাই। এই কৃতিত্ব কাউখালী উপজেলার মগাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর আদিবাসী ছাত্রীদের। বিদ্যালয়ের হয়ে তারা অংশ নেয় প্রথমবারের মত আয়োজিত বঙ্গমাতা-বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে। প্রতিযোগিতার সব রাউন্ড পেরিয়ে তারা ফাইনালে উঠে। ৩০ ডিসেম্বর ২০১১ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অটলা প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হারিয়ে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়। প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলে আদিবাসী শিশু কিশোররাও এক সময় ক্রীড়াঙ্গন মাতাবে- এ যেন তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের চম্পা চাকমা এই সত্যকে আরো প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোতেও আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের দাপুটে পদচারণা। মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, চাইন সিং মং, মং মং সিং, দীনেন্দ্র ত্রিপুরা, হ্লা সিং নু, দীপোজ্জ্বল খীসা, ললিত সি চাকমারা নেতৃত্বে আছেন স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থায়। ঝুমা দেওয়ান, ঐশ্বর্য চাকমা, ক্রাযাই মারমা, তিমথি খিয়াং, স্ট্যামিনা খিয়াং, না উ প্রু মেরী, ব্যাকি ত্রিপুরা, বিনোতাময় ধামাইরা বিদেশী সংস্থায় কাজ করছেন পেশাগত দক্ষতা নিয়ে। নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সভা, সেমিনারে।

ভিন্নধর্মী দু'টি গল্প এবার বলা যাক। রাঙামাটির মনোঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী নিখিল চাকমা। পড়াশুনা শেষ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি এন্ড এনভাইরালমেন্টাল সাইন্সে। রাঙামাটির স্থানীয় এক উন্নয়ন সংস্থায় তার পঠিত বন সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে তার চেনা-জানার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয়। এক পর্যায়ে সুযোগ আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণি বিদ্যা বিভাগের হয়ে পিএইচডি'র জন্য অধ্যয়নের। ২০০৯ সালে শুরু করেন Rodent population outbreaks in relation to bamboo flowering in the Chittagong Hill Tracts শিরোনামে তার গবেষণা কর্ম। ইতিমধ্যে ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা আর অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে তিনি তার গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন। ২০১৪ সালের মধ্যে তার গবেষণা সমাপ্ত হবে।

পাহাড়ের আলো বাতাসে বেড়ে উঠা আরেক উদ্যমী তরুণ সুপ্রিয় চাকমা। তার আগে *বাঘ* নিয়ে গবেষণার মত জটিল কাজে এগিয়ে আসেনি কোন পাহাড়ী যুবক। তার সংস্থা WildTeam এর হয়ে তিনি "Assessment of large mammals of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh with emphasis on tiger " বিষয়ে কাজ করছেন। তিনি আশাবাদী চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনে সক্ষম হবেন।

পাহাড়ে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের ভূমিকায়ও এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন তরুণ প্রজন্ম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পরই জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা নির্বাচিত হন বিলাইছড়ি

উপজেলার চেয়ারম্যান হিসাবে। তার নিবাস দুর্গম বিলাইছড়ির সীমান্তবর্তী ফারুয়া ইউনিয়নে। বিলাইছড়িবাসীরা তরুণ নেতৃত্বের প্রতি আস্থার এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ভোট বিপ্লব ঘটিয়ে।

একটা সময় ছিল আদিবাসীরা ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী পোষাক পরতেন অনেকটা নিয়ম রক্ষার খাতিরে। চাকমা নারীদের পিনন- হাদিতে আছে শিল্প আর মেধার সুক্ষ কারুকাজ। তবে এগুলো চটকদারিতা আর আধুনিকতার মানদন্ডে পিছিয়েই ছিলো। কিন্তু তেনজিং চাকমা, দেবাশীষ চাকমা, আরশি দেওয়ানরা এখন এসব পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে ঘটিয়েছেন বৈচিত্র্য আর চাকচিক্যের অপূর্ব সমন্বয়। ২০০১ সালে রাঙামাটিতে তৎকালীন *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট* মিলনায়তনে তেনজিং আর আরশি আয়োজন করেছিলেন প্রথম আদিবাসী ফ্যাশন শো। ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিলো সকলের। এটিএন বাংলার হয়ে এ ফ্যাশন শো'টির নিউজ কাভার করতে এসেছিলেন মুন্নী সাহা। সাম্প্রতিক সময়ে আনন্দ আর খুশীর উৎসবে পিনন-হাদি পরিধান এক ধরনের ফ্যাশন। এর ফলে প্রবাসী আদিবাসীদের মধ্যেও ঘরোয়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নিজস্ব জাতিসত্তার পোষাকি পরিচিতি তুলে ধরার আগ্রহ বেড়েছে। এই কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার তেনজিং চাকমা ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়াশুনা করেছেন ভারতে। আর কানাডা প্রবাসী আরশী দেওয়ানের আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী বয়ন শিল্প আর ইতিহাস নিয়ে পিএইচডি'র কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

পাহাড়ের কোন মানুষ এর আগে দেশের আপামর জনগণকে এভাবে আন্দোলিত করতে পারেনি। সেই একজন হলেন -বাংলাদেশের প্রথম আইডল মং উ সিং মারমা। মং নামেই তাকে সবাই চেনে। জাতিভেদ ভুলে পাহাড়ের সব মানুষ তাকে আইডল বানাতে যেন এসএমএস এর সাগর বইয়ে দিয়েছে। তার এই অভাবনীয় উত্থান বিশেষত আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে সাহস জোগাবে অনন্তকাল ।

পাহাড়ে ঘুরতে আসা দেশী বিদেশী সব ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে আদিবাসী খাবার নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। *সাবারাং, রুফ, কেবাং, তুগুন, ফিলিংস, আইরিশ* এসব আদিবাসী রেষ্টুরেন্টের সব ক'টির পরিচালনায় আছেন আদিবাসী তরুণেরা। ব্যবসাবিমুখ আদিবাসী তরুণ প্রজন্মের মানসিকতার নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। রন্ধন প্রণালী, খাবার পরিবেশনায় আরো পেশাদারিত্ব আনতে পারলে এ ব্যবসায় ভবিষ্যতে অনেকের কর্ম সংস্থান হবে।

এবার আসি সমতলের আদিবাসীদের কথায়। বছর দুয়েক হল ভাষা যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট ভিত্তিক মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায়। যার সংক্ষেপিত রূপ উইকি। উইকিতে যুক্ত হওয়া তৃতীয় ভাষা এটি। বাংলা ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা যুক্ত হয়েছে তার আগে। এই উইকি নির্মাণ কার্যক্রমে নেতৃত্বে ছিলেন এক উদ্যমী সাঁওতালি তরুণ সমর মাইকেল সরেন।

তারও বছর খানেক আগে ইউনিকোডভিত্তিক সাঁওতালি টাইপিং সফটওয়্যারও 'হাড় কাথা' চালু করেন তিনি। এরফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই নিজ জাতিসত্তার পরিচিতি, লোকজ সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা তথ্য, উপাত্ত ও ছবিসহ যুক্ত করে মাতৃভাষার পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপশি সার্বিক উন্নয়নে উইকিতে কাজ করতে পারছেন। বাংলা উইকির জন্য 'বিএন' এবং ইংরেজি উইকির জন্য 'ইএন' এর আদলে আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আইএসও'র ল্যাঙ্গুয়েজ কোড হিসাবে এসএটি শব্দটি বেছে নেয়া হয়েছে। সমর সরেন বর্তমানে সাঁওতাল উইকি বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক। সেই সাথে পালন করছেন *হেরিটেজ আর্কাইভ* এর আইটি এডমিনিস্ট্রেটর দায়িত্ব।

শুভাশিস সিনহার জন্ম ১৯৭৮ সালে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ঘোড়ামারা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত মণিপুরী পরিবারে। হাই স্কুলে পড়া অবস্থাতেই মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও বাংলা–দু'ভাষাতেই সিলেটের স্থানীয় এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকায় তার কবিতা, প্রবন্ধ ও কলাম প্রকাশ হতে থাকে। এইচএসসি পাশের পর 'মেঘ-বৃষ্টি-রোদ' নামের একটি নাটক লিখে ও নির্দেশনা দিয়ে ঘোড়ামারাতেই গড়ে তোলেন 'আধুনিক নাট্যগোষ্ঠী'। ১৯৯৬ সালে গঠিত সে নাট্যদলটি পরবর্তীতে ২০০০ সালে এসে 'মণিপুরী থিয়েটার' নাম ধারণ করে। এ দলের ২৮টি নাটকের প্রায় সবকটির নির্দেশনা তারই। তার লেখা 'ডালিমকুমার' নাটকটি ঢাকার প্রথম সারির নাট্যদল 'নাট্যকেন্দ্র' দেশে এবং দেশের বাইরে সাফল্যের সাথে নিয়মিত মঞ্চস্থ করছে। নাট্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার আগে শুভাশিস ২০০৫ সালে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সার্ক রাইটার্স কনফারেন্সে সাত সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ-প্রতিনিধিদলের সর্বকনিষ্ঠজন হিসাবে যোগ দিয়ে কবিতা পাঠ করেন। কবিতার পাশাপাশি লেখেন গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস। মণিপুরী থিয়েটারের নাটকের প্রায় সবগুলো গান লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন শুভাশিস নিজেই। মঞ্চনাটকের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি টেলিভিশন নাটক লিখেও প্রশংসা পেয়েছেন শুভাশিস। তার লেখা 'সুর-বেসুর' 'ক্যাথারসিস', 'চোর', 'জমিন', 'মানুষ ও একটি অমানবিক আখ্যান' ইত্যাদি নাটক বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত হয়ে সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। নিজগ্রামে প্রয়াত পিতার দান করা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজস্ব থিয়েটার স্টুডিও 'নটমন্ডপ'। এটি বাংলাদেশের প্রথম থিয়েটার স্টুডিও। মণিপুরী থিয়েটার এখানে নিয়মিত দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চায়ন করছে। মণিপুরী নাটক ও সাহিত্যে অবদানের জন্য শুভাশিস ইতোমধ্যে পেয়েছেন ভারতের আসাম থেকে *'দিলীপ সিংহ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার'।* পেয়েছেন গীতিস্বামী এ্যাওয়ার্ড, ভারতের শিলচরের এল. এল. প্রোডাকশন-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক, জাকারিয়া স্মৃতি পদক। ২০১১ সালে সৃজনশীল নাট্যতরুণ হিসেবে নাট্যধারা প্রবর্তিত বহুল আলোচিত তনুশ্রী পদক লাভ করেছেন শুভাশিস সিনহা। সর্বশেষ শুভাশিস তার 'হওয়া না-হওয়ার' কাব্যগ্রন্থের জন্য বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'এইচএসবিসি-কালিও কলম সাহিত্য পুরস্কার' অর্জন করেছেন। 'কুলিমানুর ঘুম' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ পুরস্কার।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে শুভাশিস সিনহা ছাত্রজীবনের ইতি টানেন ২০০৪ সালে।

পর্যাপ্ত তথ্য আর সময়ের অভাবে আরো কারো কথা লিখতে পারিনি। আমি সে দায় স্বীকার করছি অকপটে। এ লেখা দাঁড় করাতে হাত বাড়িয়েছি গুগল আর ফেসবুকে। আবার কেউ ই-মেইল, মুঠোফোনে শেয়ার করেছেন নিজেদের অভিমত। এভাবেই জেনেছি আপন আলোয় ভাস্বর ত্রিমিতা চাকমা, চমুই ত্রিপুরা, ইয়েন ইয়েন, কাইংওয়াই ম্রো, তনু মুরং, মং এ মগ কথা, ডা সুবর্ণা তঞ্চঙ্গ্যাসহ আরো অনেকর কথা। শুনেছি কমল, শান্তিময় আর ঝন্টু চাকমার টিভির জন্য মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার খবর। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় *নাটক ও নাট্যতত্ত্ব* পড়া শেষে রাঙামাটির দ্যানিস চাকমা স্থানীয় পর্যায়ে কিভাবে যুক্ত আছেন নাটক রচনা আর নির্দেশনায়। নতুন করে শুনেছি রাঙামাটির তরুণ প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পী রলী চাকমা, জ্যাসি চাকমা, বর্ষা দেওয়ান, রিংকু চাকমা, কোয়েল চাকমা, দৃপ্ত দেওয়ান বাপ্পী, লুম্বিনী রায়, সুজানা চাকমা কেকা, নেত্রী রায়, জিকো মারমা, রণেল মার্মা, লাভলী আসাম, সুভদ্রা ত্রিপুরা, ম্যানিলা চাকমাদের গানের আসর মাতানোর সংবাদ। অবাক হয়েছি জেনে বিভুতি চাকমা, জ্যোতি চাকমা, সম্ভুনাথ চাকমা, বিজ্ঞান্তর তালুকদাররা এখন অনলাইনে চালু করছেন চাকমা বর্ণমালা ।

এই লেখার ইতি টানতে চাই রাঙামাটির অদূরে বন্দুকভাঙা ইউনিয়নের বিজয়া চাকমার গল্প শুনিয়ে। চার ভাই-বোনের মাঝে সবার ছোট সে। তাদের অনুপ্রেরণাতেই সে বাংলাদেশ-সুইডেন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট থেকে ২০০৮ সালে *কম্পিউটার টেকনোলজিতে* ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। বিজয়া সব সময় চেয়েছে নিজ উদ্যোগে কিছু করতে। তার দেখা স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়ে ২০০৯ সালে উত্তর কালিন্দিপুরে সে চালু করে *কে এস কম্পিউটার এন্ড লার্নিং সেন্টার*। এটি ২০১০ সালে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদন পায়। এ পর্যন্ত প্রায় ১২/১৩ টি ব্যাচ ৩ মাসের এই কোর্সটি সফলতার সাথে শেষ করেছে। এখানে প্রশিক্ষিত হয়ে কেউ কেউ পেয়ে গেছেন আপন ঠিকানা। বিজয়া চাকমা বৃত্তাবদ্ধ চাকুরী জীবনের পথে যেতে চাননা। এভাবেই এগিয়ে যেতে চান বিজয়ীর হাসি মুখে নিয়ে।
(বিঃ দ্র ঃ এই লেখাটি প্রথম আলো বন্ধুসভার অমর একুশে বিশেষ সংখ্যা ২০১৪ 'তারুণ্য তে ছাপা হয়)।

.....

* অম্লান চাকমা, সদস্য, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক), রাঙামাটি ।

লিটন চাকমা অন্নদা

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের অমনযোগী চাষাবাদ ব্যবস্থা

আজকাল গ্রামের ছোট ছোট চায়ের দোকানগুলোতে মানুষের ভিড় দেখা যায়। মনে হবে দোকানদার এর ব্যবসা ভালো চলতেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন একেক জন কাস্টমারের বকেয়া হাজারের নিচে নেই। সকালে ও বিকালে গল্প করে অলস সময় কাটায় দোকানে দোকানে। এ অবস্থার পেছনে রয়েছে মানুষের কর্মহীনতা। তারা আর আগের মত চাষাবাদ করেনা। অর্থাৎ চাষাবাদে মনযোগ কম, কেউ ছোট খাটো ব্যবসা করে, কেউ কেউ চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। চাষাবাদে এ অবস্থার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে।

কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ না করাঃ

অধিক ফলনের আশায় মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মাটির উর্বরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই ভারসাম্য রক্ষার জন্য আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আদিবাসী কৃষকেরা তা করতে অভ্যস্ত নয়। কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সারি করে জমিতে ধান রোপণের পরামর্শ থাকলেও তা কেউ অনুসরণ করেনা। কারণ আদিবাসীরা মনে করে এ পদ্ধতিতে পরিশ্রম ও সময় দুটোই বেশি লাগে। আজকাল জমিতে আগাছা পরিষ্কার করা হয় রাসায়নিক আগাছা নাশক প্রয়োগ করে। এতে মাটিতে থাকা উপকারী অণুজীবগুলো ধ্বংস হচ্ছে ফলে জমির উর্বরতা আরও দ্রুত কমে যাচ্ছে।

কৃষি পণ্যের স্থানীয় বাজারমূল্য হ্রাস পাওয়াঃ

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শহরের বাজার থেকে সবজি ক্রয় করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। এতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সবজির দাম কমে যায়। তাছাড়া সংরক্ষণাগার না থাকায় দীর্ঘ সময় রাখা সম্ভব হয়না। তাই পচে যাওয়ার আগে কম দামে বিক্রি করতে হয়। আদিবাসীদের উৎপাদন একমূখী অর্থাৎ একই ধরনের ফসল বার বার উৎপাদন করে। মিশ্র ফসলের চাষ করেনা। কোন বছর নির্দিষ্ট কোন ফসলের দাম বাড়লে পরবর্তী বছর হতে সবাই ঐ একই ফসল চাষ করে ফলে স্থানীয় বাজারে দাম হ্রাস পায়।

যান্ত্রিক নির্ভর চাষাবাদঃ

গরু দিয়ে হাল চাষ এখন কমই দেখা যায়। সময় বাঁচাবার জন্য পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে জমি চাষ দেয়া হয়। সময় সাশ্রয় হচ্ছে কিন্তু গরু দিয়ে হালচাষ করলে হয়ত গরুর গোবর জমির উর্বরতা কিছুটা হলেও যোগ করত। পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে জমি চাষ করার পর জমিতে কোন জৈব সার প্রয়োগ করা হয়না। আগে জমি চাষের জন্য কৃষকের ঘরে গরু

থাকত আর গরু চড়ানোর জন্য একজন রাখাল বাৎসরিক দরে নিয়োগ করা হত। এখন কৃষকের ঘরে গরু না থাকার কারণে রাখাল রাখার প্রয়োজন হয়না। এতে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতা আরও বাড়ছে।

বনায়নের প্রতি ঝোঁক বেশিঃ

আদিবাসীরা সেগুন ও রাবার এর বাগান প্রতি বেশি মনযোগী হচ্ছেন। কারণ বনায়নে নির্দিষ্ট সময়ের পর একসাথে অধিক অর্থ আয় করা যায়। কিন্তু সেগুন ও রাবার মাটির মাটির উর্বরতাকে কমিয়ে দিচ্ছে এবং পরিবেশ সম্মত নয় তা কেউ মানতে রাজি নয়। কেউ কেউ অনেকের মুখ থেকে শুনে যে, অমুক জায়গায় একটি আগার গাছ ১৬,০০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ধরনের সংবাদে অধিক লাভের আশায় এখন আগার বাগানও বেড়ে চলেছে। অথচ যারা বাগান করতেছে তারা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারেনা যে ভবিষ্যতে এ আগার কোথায় বিক্রি করবে। মোট কথা যাচাই না করে অপরিকল্পিত বনায়ন। যার ফলে চাষাবাদে মনযোগ কমে যাচ্ছে।

আস্থাহীনতাঃ

কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুসরণ করা হয়না। কি পদ্ধতিতে চাষ করলে কীরূপ ফলন পাওয়া যায় তা আদিবাসী কৃষকেরা বিশ্বাস করতে চান না। কোন বছর কোন ফসলের ফলন ভাল না হলে পরবর্তী সময়ে তা পুনরায় চাষ করলে ফলন ভাল হবে কিনা এ ধরণের আস্থাহীনতা কৃষককে অমনযোগী করে তোলে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও আরও অনেক বিষয় থাকতে পারে যা কৃষকদের চাষাবাদে অমনযোগী করে তোলে। তাই বাস্তবে কিছু করে দেখানোর মাধ্যমে চাষাবাদে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এজন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে প্রতিটি গ্রামে অধিক প্রদর্শনী প্লট থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন কৃষকের সফলতার কাহিনী ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন, প্রচার মাধ্যমে এ ধরনের নাটক তৈরি করা ইত্যাদি কার্যক্রম এর মাধ্যমে আদিবাসী কৃষকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

.....

* লিটন চাকমা অন্নদা, সভাপতি, বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি।

মৃত্তিকা চাকমা

কবিতের গদঙ্গ কলিকাতা

উঃ কলিকাতা! কবিতের গদঙ্গ, হোস্যে বেঙ্যার কলিকাতা!
আহ্মেক্কন চিবেপদ আহ্ঘালাক পদ, মেলাখ পদ
বলামাদি, কবিতে ফগায়- ম্যাহ্ধ পাং
মর নিরোজ মাদি কাচকাবাস্যা, সেনে-
কবিতের গদঙ্গ চেবার এস্যং, হালিক ইহ্নঝিব নয়
চম্পক নগরর মাদি রেখখজর টানাটানি, ইরুক;
আভা নালত কবিতে স্ববন দেঘে আ মুজঙ্যা যায়।

কলিকাতাত্তুন চম্পক নগর
হোস্য বেঙ্যা, বরব' সাম্বাদ দেয়
করলা টারেং কেয়বান্যা শিলপানি নাল। ছন্দ্র ভন্দ্র
সুদত্টুবী তোগায় সুরুং সুরুং গাদ,
ঢ়ংরাঙ্যার পুন'ভেদা সুচুরনি, কেজন্যান পাহ্র
বান্দ্রা সগরি গুল' ফেলেই ধাবা দেয়
সাপ্যার কাঙেল ভাঙি কেঙর বেঙর
অরলী বদা চাক্রোই
চাস্যা সুগজ্যার বিজে দমাদমা
রানী মিলের পাগানা জুম সারানাধা।

কি অহ্ল'! কি অহ্ল'! হোস্য বেঙর বরব' সাম্বাদ?
চম্পক নগর সত্রসান, মাদ বুল এরা এরি
কবিতের দিগ ঘুন পোজ্যা, ইখ্কু বানা-
হোস্য বেঙ্যার পিদ হোসহোস্যা ;
কলিকাতা ; উঃ কলিকাতা! কলিকাতা, কবিতের জনম
কবিতার বাগান ঝালাবব্র, কলিকাতা তুই বানাহ্ কলিকাতা।

.....

* মৃত্তিকা চাকমা, শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়, সদস্য, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক), রাঙামাটি।

তরুন কুমার চাকমা

মন কানিল্যা

মন কানিল্যা মন ধরি থাক
চোগ কানিল্যা পুঝি ফেলা
নিজ'রে এধক ফেলাযেইয়ে চিগোন ন' ভাবিচ
কি মন' দুগ ঝারি ফেলা ॥
আর' তোগা যেই সুগ কুধু পায়
দুগর কাল্লোং গোচ্ছেই দে
মন উজু গর পদ পুঝোর গর
মুজুঙেদি ধুয়া গোরি দে
চের' কেত্যা খেলাং খেলাং সাগর মেলা খোলা ॥
বিজোল পদত আহ্ধি ন' যেই
দমদমা ভুইয়ত গারা ন' যেই
ধর্ম পদর রেগা পার ওই
নির্বাণ পদত আয়না হুচ বারেই
ভান্যা কামানি পুরি ফেলা ॥
হাক্কন্যা জিংকানীত কি গোরিল্যা কি পেলে
অক্ত এলে বেগ ফেলেইন্যায় বেক্কুনত্তুন যা পরে
দুগত ন' থেই দুগ ন' পেই বুদ্ধ কথা ধর
বনভান্তেস্ম কি কোই গেল' সিনি সুরন গর
ধর্ম পদত ধালি দেঘি ত কোচপানা ॥

.....

* তরুন কুমার চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙ্গামাটি

চাত্যেই

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা

বিদুঙি বেভের রাঙাকালা আহ্জিবুয়া
যাক যাক কালা মেঘ সমারে আহ্জি যার
সোহ্জ রঙর চোগো কনাউন অনসুর বিরবিরেয়
পল্লাপল্লি দেজত খারা খয়।
নিগুচ নিচিদি মন আদিক্যে ডাক্কো রাদা ধক
খক্রে খক গুরি আভাংপাং মেলি চেদ' চায়
তেল দিয়্যা চুলোর জদত বানি
পাংকাধক ঘুরে ঘুরে লুঙিমারি
ফেলেক' চায় অহ্দত।
চোকখুন পন পানিত খরা কয়
মনানে রেজ্যো উগুরে রেজ্যোত
আভাংপাং মুল্লুগোত বজত্তি গত্ত চায়
চায় ভিলিনেই নিগুচ বিজিরেই
আহ্জি খলক খলক ঈধঘর
উমিয়্যে উমিয়্যেগরি বিরবিরেই
থিবুরুক খেয় আ বেচ চাত্যেই।
বিদুঙি বেভের থুতুতুয়া অনসুর মাধে
বুবে স্ববণ দক আমাদি ভাচলোই
তিরোজ' উগুরে তিরোচ বাহ্রি
নেই আলসি চিদে লোই
উঙুদো উগুরে উঙুদোত বুহ্রমারি
পাথরত বিজোলত মনান সাহ্জুরেয়
আন্দারত বুহ্র মারি ঘুলোত চোকমেলি
বিদুঙি বেভের সাল্লেঙক্তুন ধুরি ঘেয় খেই খেই
টানা পোজ্যেন বাজেই
আদিক্যে থাহ্ন পহ্রত উধি
রিনি চায় ম্যেন ম্যেন কালা।

ম্যেন ম্যেন কালা পহ্রত
ধহ্লক্তুন ধহ্ল আন্দারত
বুহ্রমারি বিজিরেই
রাঙা কালা ধহ্ল গরা, য়েহল
সোহ্জ
চাজি চাজি মাধে চেয়
এবার তে'
মন বিদুঙি বেভেই ধিবিরেয়
অজন নেই পদ' স্ববনত---

.....

* ঝিমিত ঝিমিত চাকমা, প্রধান শিক্ষক, মো.আ.বি, নীতি নির্ধারণী কমিটি সদস্য, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক), রাঙামাটি।

জগৎ জ্যোতি চাকমা

কবালর ভাচ্চানি

ইক্কো শিলত্তলে ইক্কো কাঙারা;
যধা অবার নাং নেই – যু নেই,–
কিঙিরি সালেন অব পিবিরের গিরিত্তি?

ইধু ভঙদন অসাগর বিচ্ছুক শিয়েলর ধবধবা আওঝিলোই,–
তারার বুগত কধক বাবদর বিগিদি – টেকটিজর কজ্জাল কানাত;
উজু-সুরম্নং মনুরার বুক বার্বো-হুজিয়ে অজল অয়
কার মুঅর সাদাঙা মিধে আজি দে-ই?
কার বেসদর-কধাতারা শুনি তে আঘাজর চান-তারা আদ টানে?

রাধামনর আওঝ দেঘি মু চিমেইচিমেই আজে সিবে কন্না?
যত্তনে তালেইয়ে সবন-ধারাজ কুধু তার আঝি যায় বে-থারত;
ধনপুদির পিনোনর চাবুগি লুঅর গঙলানিত ভিজি যায়।
কধক আর সিজ্জদর দোর্যেত বঙিবে মনুরা তুই?
কবালর ভাচ্চানি ফরাক ফরাক অই উধে ঝিমিদৎ।

১৫.০৩.২০১৪

.....

* জগৎ জ্যোতি চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি

(এক্কো ছড়া কবিতে)

থগারাম

বীর কুমার চাকমা

নাঙ তার থগারাম
গরে তে জাদ' কাম,
ঘর নেই জাগা নেই
নিজো নাঙে কিচ্ছু নেই।

গান লেঘে সুর দে.
কবিত্যেয়্য লেঘে তে,
নাটক গরে পারামায়
সেন্দি কিজু টেঙা কামায়।
এই পেলে এই থুম,
নিত্তো তার কানাহুম।

ইত্তোকুদুম ভেইবোন
সমাজ্যের নেই থুম,
যে কাম ধরে তে
থুম গরি সারি দে।

হালিক তার চাগরী নেই
কেনে চলে উধিজ নেই,
যেন্দি যায় থগা খায়,
তুও তে টুদি ন' থায়।
মানজ্যরে তে ন' থগায়,
ন' থেলেয়্য ফিরি চায়।

নিরেতিত্যেত্ পরিলে
সমাজ্যেউন ধরিলে,
তানি তুলোন তারে
সেনে তে বা'র গরে।

সৎ পধে চলে তে
অসদ পধে ন' আহ্ধে,
ইত্তোকুদুম ভেইবোন
ন' মাঘে তে কার'ত্তুন।
পাল্যে আর' থগান তারে
সেনে আর' দুগ বারে।

ভারি উজু মনান তার
থেলে গরে উবগার,
উবগারর লাধি খায়
বেচ্ গরি থগা খায়।

গোঝেন'ত্তুন মাঘে বর
পেদেভাধে চলিবের,
কালচারাল কাম্মো তে
বেক্কানি ইত্তুক জানে ধে।

এই অহ্ল' থগারাম,
রেজ্জ্যো বেরেই গরে কাম।
তা ধঘে তে থেদ' চায়,
মান ইজ্জত কম তগায়।

কিয়্যজনে কোচপান'
বেঙাচোগে কিয়্যই চা্হ্ন।
যে যিয়েন কোধোক তারে,
তা কামান তে গরে।
ইয়েনি অহ্ল' তা কাম,
তা নাঙান থগারাম।

১৮/০৩/২০১৪ইং
জাক অফিস

* বীর কুমার চাকমা, সুরকার, সঙ্গীতশিল্পী ও সদস্য, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল(জাক)।

কিশলয় চাকমা

তরে কোচপাং ভিলি

তরে কোচপাং ভিলি
পত্তিদিন বেলান উদে
চের'পালা পেগে গীদ গান,
তরে কোচপাং ভিলি
ত' নাঙে ম' নাঙে বেক্কুনর নাঙে
আওজে ফুল ফুদি যান
তুম্বাস ছড়ান।
তরে কোচপাং ভিলি
অজল মুরোমুরি
আইল্যম ডাগি যান
তরে কোচপাং ভিলি
কোচপানা মাবামাবি
কোচপানা সমানে সমান
মুই থক চাং।
তরে কোচপাং ভিলি
ঘর-দোর ভাঙাভাঙি
চুবে চুবে ভুজোল বায়
তরে কোচপাং ভিলি
কানি কানি কালাপানি
নিচেদে লামি যায়
গায় গায়।
তরে কোচপাং ভিলি
গেংখুলী মন মর
বাজি বায় তুরু তুরু
তরে কোচপাং ভিলি
সাতাই বৈদ্য সাধন বৈদ্য
ধুরি লং গুরু
পাত্তুরু তুরু পাত্তুরু তুরু।

তরে কোচপাং ভিলি
লাংদা কোবির কবিতার নাং
কুদু তুই"
তরে কোচপাং ভিলি
পিথিমীর উত্তর কূলে তুই থেলে
দখিন কুলে মুই
মধ্যে সাগর মুরোমুরি ভুই।
তরে কোচপাং ভিলি
গুচ্ছেয়্যে এই জীংকানি
বিল্লো ফাত্তো ওই মরে,
তরে কোচপাং ভিলি
রোদ দে-ঝর অয়
কোচপানা আগে ঘরে ঘরে
সুগোর পিরিত্তি গরে।

* কিশলয় চাকমা, কবি, উন্নয়ন কর্মী, খাগড়াছড়ি ।

বুদ্ধিয়ে কুল ধরে

চাঙমা বারেন্দ্র লাল

তাথ্যা নহমন তাদুনি নহমন
তাহারা দ্বিব্যেপুহ নহ মন,
নহয়ানত ছহয় নহ মন।
তারা লগে নেযেবার
ছাগল এক্কু পানবিব্যে এক্কু
তারা কেনে পার অহবাক!
ছাগলো আ পানিবিব্যেবো পারগলে
ছাগলোই পান বিরেব্যে খাই!
বানা ছাগলোরে পার গলে
ছাগলোরে বাঘকুয় খাই!
তাথ্যা মাধাত চুল নেই-বুদ্ধি গরি কুলনেই..
তারা আগন ভাবি ভাবি...
নহয়ান আ গাঙানরে রেনিচেই!
দ্বিকুল ফাদি নাল আদি
গাঙ মুরো ছড়া-ছড়ি পানি লামের ঘুমগুমেয়!
মাধাত তুলি পানি ঢালে
গঙামাত্তুন হাদজুর গরি বরমাগে।
গঙামা ও গঙামা-কাক্কন তুই ঠামা ঠামা
আমি আক্কে পার ওইনা।
পুইল্যা খেবত-
ওপুহলক ও পুতলক
তুমি দ্বিভেই পার অহনা
দ্বিভেয়েত্তুন একভেই থেই একভেই এ-য-
এ বুদ্ধিয়েন তুমি ধর-
দ্বি'ভেয়েত্তুন একভেই এ-ল
দ্বিখেবত
তাদুনিরে ফেলেই- তাথ্যা এবার পার অহল
তাথ্যা পার ওই তে-ক-ল
ও পুত তুই আর ফিরি উলো পার অহ
দ্বিভেয়ে জদা ওই সংসমারে পার অহ

তিনখেবত-
তাথ্যা আর এককুয়া পুহরে ক-ল-
ওপুত তুই ছাগলোরে আন্দোই
ছাগলোরে পারগড়েই ফিরিউলো
পানবিরেবো আনিবেগোই
পানবিব্যেবো পারগড়ি
চের খেবত
দ্বিভেই সংসমারে পার অহলাক
আরেক ভেইয়ে পার ওই
পাচ খেবত-
তাদুনি পার অহল নহয়ানদোই।
শেষ পলাত-
এক ভেইয়ে পার গড়ে-ল-ওভেয়োরে
বাপ-মা-কধা মাধাত তুলি
হাদে বুদ্ধিয়ে লাল ধারি
কধা বাত্তায় সংবুদ্ধি
পার অহলাক বেক্কুন
গঙানদী। "থুম"
এ-কুজলী
লেগা-পাদে-ল
চাঙমা বারেন্দ্র লাল
লুক-কুদুম কুলিং কর্ণার
ছলকদোর বাজার
বরকল-রাঙামাট্যা
মুরোল্যা চাদিগাং।

.....

* বারেন্দ্র লাল চাঙমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙ্গামাটি।

নির্মল কান্তি চাকমা

হেদাফল

তারে দেলে মনে অয়দে
ন খেবদে মানযে খেবদে দখ্
হালিক খেবার চেলে খেই ন পারে
নাঙ তার হেদাফল।

ইরুক পিত্তিমিগানত এ ধক্কে হেদাফল
নিগিল্লোন ঝাগে ঝাগে
দুরত্তুন তারা রাঙাসাঙা
ভিদিরে তিদে হেদাফল সান
তারার মিধে মিধে রসবলা জবানলোই
আমি নাজুক কাজুক।
তারা স্ববন দেগান আমারে
মিজে স্ববন, মিজে আজা দোন
যেন্ দ্বি বজচ্ছে চিগোন গুরোরে
বুজ দে পারা।
আর আমিও 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'
এ মন্ত্রবোলোই ঝারপুকগুরি
নিজে রাজা উদিবের চে'য়
নিজো সেদাম হুদ্দুর হবর ন পেনেই।
আমা জের তম্বাগুনোরেও এবান্যে শিক্ষেদি
ডাঙরগুরি তুরির, তারারে ঘেল দি
অসৎ, বেয়াদব আখ্যায়িত গুরি
নিজো মাদাপেজা রিনি ন' চেয়।
সেত্তেই পিত্তিমি দখ্ ন পাল্টেলেউ
মানযোর পেজা পাল্টে যার
দিন দিন ওই উদির হেদাফল সান।

* নির্মল কান্তি চাকমা, পাঠাগার সম্পাদক, বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি।

সুগম চাকমা

ম' দেঝ

এজ' রেদ জাগিনেই মুই স্ববন দেঘং
এজ' পেগ রয়ে মর ঘুম ভাঙে
এজ' বেন্যে অহ্য়।

চোগে রিনিনবাচ্যে চেরকিত্যে জুম
জুমঘর আর জুম্মবি
কোচপানা মিঝি আঘে ঝারবো ফুলোর তুমবাজে।

এজ' আঘে সেই পুরোন ধক্যে
মন নাজেয়ে মাত্তল সাজন্যে
জুমঘরর ইজোরত সেই উভগীদ।

পিত্তিমিয়ান দোল
দোল ম' এ দেঝ
জনমান মুই বাজিবের চাঙ এ পিত্তিমিত।

* সুগম চাকমা, সদস্য, বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি।

স্মৃতি জীবন তালুকদার

অলি অলি

অলি অলি অলি
ঘুম যায় সোনা চিজি
দুলনানত পুরিনেই
তদাত পিনি পিজি।

ছারা ঘর হুগুরবো
গিরোচ্ নেই রুং কারের
ঢিঙি শালত নানু বঝি
জুম্মো চোলুন ঝারের।

চোগ ঝোলেয়ে বেলেইবো
বানা লেজচান বিজে
ছরাত যিয়োন মামা দাঘি
আনি দিবেক ইজে।

মন কানানি রাঙে কবো
কুরে ঝুবো সেরে
জুমোত যেবং চিজিলোই
আমি বেগ জেরে।

শের চ'বো র' মেলি
চিজি চিজি ডাগের
সারাল্যে চিল ভঙি ভঙি
বানা ঝর মাগের।

.....

* স্মৃতি জীবন তালুকদার, সহকারী শিক্ষক, বনযোগীছড়া উচ্চ বিদ্যালয়, জুর'ছড়ি।

মনো রঞ্জন চাকমা

অহ্ক কধা

যে গম জনম্মো গম
যে বজং জনম্মো বজং।
কারে কি কবে?
অহ্ক কধা কলে দুক্খান তার বারে।
ইয়েন এক্কান দেশ
বজঙর্ সমাচ্চে বেশ
লুক কুদুম জিন্দি পাই।
বজং তে, ইক্কে কলে
মানি ন পারিবোসে কধাগান
একপাগে নয় একপাগে
কেনা বানিনেই,
খেইদের তার জীবনান।
তে আর গম, খায় আবেলেশ
কন্না কি গল্লো।
এম্বা গম মানুষ, বেচারারে
কন্না মাল্লো ?
কমলে এব' তার দিন্নো
ভালুক জনে চেই আঘন।
যে গম জনম্মো গম
যে বজং জনম্মো বজং।

.....

* মনো রঞ্জন চাকমা, শিক্ষক, নাট্যকার ও গীতিকার, শুকনাছড়ি, বনযোগীছড়া, জুর'ছড়ি।

নম দীশ চাকমা

আদাম ভাঙা জু উঠ্যা

গেলুং আমা পুরন আদামত,
বেরেলুং বেক্কানত।
মুরুব্বি অহ্য়ন জাক্কুয়া,
নিয়ম নীদি অহ্ইয়া পাক্কোয়া।
মদ খাদন জু হারা হদন
আহ্রাদন টেঙা পয়জ্যা।
এক দাগিয়ে চুর গত্তন, সিনেলি গত্তন,
ধরা পলে কধন মিজ্যা।
যারা গম, তারা কহ্ই ন' পাত্তন, দরে ভরে।
রাগাদন মনে মনে,
আকারে ইঙ্গিতে কধাক চান,
দরান্দে যদি কেয়াত পরে।
কাব্বারী অহ্লাক কুনে কুনে,
ইহ্জ্যাব গল্যা চের্বুয়্যা।
কিচ্ছু গোরি ন' পাত্তন তারা ,
দরান্দে পিচ্ছুয়া মের্বুয়া।
কাব্বারীগুনর মিধে মিধে কধায়
আদাম্যা অহ্য়ন ওলো ঝোলো।
কন্না কি কহ্র কন্না কি গরের
এক দাগিয়ে গত্তন ফোলো।
বুঝি ন' পাত্তন কিও জনে,
যেরেন্দি অবাক্কোয় জনে জনে,
আপদ বিপদ এলে,
দুগ পেবাক বেক্কুনে।

.....

*নম দীশ চাকমা, কবি, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।

সরোজ কান্তি চাকমা

পেত্তোমরা মনর ভাচ্

বিজগর কিত্য নাঙে মুই কাল,
রাজায়-বাদশায় চালাদন কিঙিরি দেজ জাদ্
সিয়ানি রিনি চেবার নাঙে মুই কান,
শুনিলেয়্য ন' বুঝং, দেগিলেয়্য ন' চিন'
হবর, ন' পাং উদয়গিরি, বিজয়গিরি
রাধামন দাগি কি এলাক, কুদু গেলাক।
কন নাকি চম্পক নগর, না চাদিগাং
কন জাগানিত কন্না এলাক।
কার রেজ্য কন্না জিদি কন গাঙত
রানিহ্ খিয়্যন ভাত।
কধক ঝার মালেচ গোরি
ছরা গাং, মোন মুর' ফারি
কন্না কিঙিরি ভঙি এলাক
এক জধা গোরি, না ভাঙি চুরি।
দেঝ ছারি জাত বাজে
আমা চৌদ্দ পুরুচ্চুন এলাক ভঙি কিঙিরি।
এ কধানি ভাবিম ভিলি অক্তে অক্তে আওজ গরে।
পুঝর গরে কি আওজ সিয়ানি ডাবি
বিজগ ঘাদি-ঘুদি যা পেবে
অহ্লে গম নাঙে কিজু পেবে, পেইনে কি!
ইক্কে দিনুন রিনি চা-
দ্বিবে চোগে ফেলে ফেলে
দ্বি-কানে আভাং পাং
দাদ' উধ' দাগি, বেগে কন ভারি ছিদে ছিদি
আবাজত রেং কারি, কদু গেলাক আহ্ঝি
চিগোন চিগোন দ্বিবে পোও
নাগর' অক্ত ঝি-
চেরোপালা নরগ দেঘি, পত্তি রেত পহর গোরি
তা মোক্কো' এজ' কানে গুজুরি গুজুরি।
দোনা থুমত কানজাবা আড়্

উমিয়্যা উমিয়্যা দামানা চাজ' বাচ
গাদুত্তুন নিগিলে উগদি উগুদি
চম্পক নগর' রান্যা ফুল' তুমম্বাচ ভিলি
মনানে গরে বিগিদি
লেদা গোরি মনানে কিদিক কিদিক উধে আহ্জি।

ইক্কে দিনর দোলবী ধনপুদি কোচপে ন' জানে রাধামনরে
কোচপায় কালা চেলারে।
সাজুঞ্যা গানছা কানি ন' বুনে
বর ন' মাগে
রাধামনে লারেয়্যত জিদোক।
ইক্কে ভাওে গাবুর উয়্যে ধনপুদি,
মাত্তর ন' পিনে পিনোন খাদি।
কামিজে- পাজামা, এক ভাক উত্ত্যা পিঠ
কমর সং ফারা- কামিজ
পেন্টিবো দেগা যায় গমে গোরি
নদি নাত্ত্যা ভাচ, আরিয়্যা-তারিয়্যা কধা
নিত্য বেরায় রেদো মায়
ইয়ানি দিগি মনানে মর আহ্মিজে লাজায়
মুয়ান ফেরায়
বেক্কানি ছাগি পুজি
কুধু আঘে তেয়্য খবর ন' পায়
বিজগ' কধানি পুরি ফেলায়।

.....
* সরোজ কান্তি চাকমা, কবি ও শিক্ষক,মালছড়ি।

সঞ্চয় বিকাশ চাকমা

গরু বেজি রজেই কিনানা

জার জারে মরামরা
পুজ মাঙে হারকরা
বামুন'র চিদেচাদা চিতপুরি
ধরং ধরং গরুর দরি ধরি।

ফাউন'র চোদ্য তারিগ নুও জার'কাদা
বামুনও জার খেই দলামজা আধাআধা
জেরে গরু বেজি রজেই কিনিল'
গিচ্যে চোত্মাচ , লাদি মারি ইরিল'।

ঠক্যে বামুন
আহ্ঝিল' সানগ্লাস পিন্যে কানাইয়্যা।

ও মাদু মা! রজেই উরিহ্ পেল'
জার দে জার, উযু জার-
বামুন্যা জিনিল'!

.....
* সঞ্চয় বিকাশ চাকমা, কবি ও উন্নয়নকর্মী

আলপনা চাকমা

মানেয়র রীতি সুদম

বর মাগং মুই সুগে তেই পারা মাগংঙ্য বর ফাং কি-ন-ফাং কিজেনী
যে যেই ভর মাগে-তে সেই বর পাই, গোঝেন-দে-বর সহজে ন-ফুরাই।
বেগে কন বর কবাল্য মুই গোঝেনে বর দিবোনি।
মানেয়্যো কন ভগবান-দে-ধন চাই মন তুলি-নে-দে কদক্ষন।
দাগ' কধা কন এলে মন্যাং লালস নেই
ন-এলে মন্যাং তালাস নেই।
মিত্যা বর মাঘং মুই কবালত জোল গোঝেন বর পেই পারে
নীতি ধরি তা পরে।
পুরনি কধা কয় পারা আহ্ধ' কালি পুজিলে যায়, কবাল লেঘা ভূজি পায়।
জ্ঞান বুদ্ধি বেঘ আঘে লিঘিবার ভাষা চেই আগে,
ভাবী-ন-পাচ্ছে দিন যা কই-নপাচ্ছে কধা থায়
ভারী লাজাং তরে মুই।
সিত্যা-কং-মুই আংকু আঘে পাংকু নেই, বুদ্ধি আঘে শক্তি নেই।
কইয়্য কধা থাই-ন-পায়, গম কধা ভাত-ন-পায়।
কিজেনি মন আঝা পুরেয়্য পারিম নি।
এক বাঁশে ঘর নয়, এক শস্য তৈল নয়, একা মানষ্য মানুষ নয়
বর মাঘং গোঝেনত্তুন সুঘে থেই পারা।
সেনত্যা দাগে কোই যেওন নিজ বুদ্ধি সোনা পর বুদ্ধি রাং
আদিক্কে পারাল্যে বদ্ধি গাজ মাতায় তাং
তিন শিরে যারতুন বুদ্ধি লগোয় তাত্তুন
গাবুর কধা কাপুর কু, কুর' কধা কুর' ঘু।
রীতি সুদম বদলেনেয় পুরনি কধা ফেলেয় দোন।
গোঝেনে বর দিলে পেবংনি দিয়ে বর পেদং গোই
জিনদি যেই শিনদি গম থেদংগোই।
রীতি সুদম ন আহ্রেদং মানেয়র সু কু রেদং
ভর মাঘং গোঝেনত্তুন মুই, অন্যেরয় ইংছ্যা-ন-থেন্যায়
বুদ্ধ সুদম পেদংগোই।

.....

* আলপনা চাকমা, উন্নয়নকর্মী, রাঙামাটি।

পাটটুরু টুরু চাঙমা

বেন্যা মাধান

ঘুমত্তুন উদি বেন্যামাধান
মত্তুন গম লাগে ভারি পোত্যা আভাগান।
পোত্যা পেক্খুনে গরন কিজিক কাজাক,
তারা কোই যান ঝাদি ঝাদি ঘুমত্তুন উধিধাক।
দিন্ন্য যায় , রেদ এযে,
রোত্তো যায়, বেন্যা মাধান এযে।
বেন্যা অহ্লে যা কামত যান তারা,
অহ্রান ওই কাম গোরি এযন তারা।
খুঝিমনে জিংকানী দোল গরন,
সেনত্তে গম বেন্যামাধান।

.....

* পাটটুরু টুরু চাঙমা, নবীন কবি, রাঙামাটি সরকারী কলেজ।

উদয় শংকর চাঙমা(মড়লা টাবিট)

ন’ পারিবে

নিগুচ গরি গরত তুলি ধুন মরে
দমে ন’ পারিবে ম বলান’ রে।
মাধালা আহ শিরে ছিনি থোক
উগুদো কামানি জনমান থোক।

গাই নয় ডানে বামে এক ঝাক,
ফুদো আঙারা সান যাত যাত
উবল পাল গরি দেদন ডাক।
ন দরাং বন্দুক গুলি
ন’ দরাং সেটেলার,
ফেরেই খাং ত শামান।

আহদ টেঙ ব্যাঙ দে
যেদক মরে মুগর দে।
না না ন পারিবে,
আত্যেই তুই বল ফেলেবে।
টেপ টেপ লো ঝরের
উল্লো মনান ন গলের।
মড়িজ্যে বারি ছিনি যার।
কিয্যে রগ ত্যাজি যায়

রাগ উত্য এচ্ছে মর,
যে গত্তে সাত উল্লো গরিম জনম ভর।

.....

* উদয় শংকর চাঙমা, নবীন কবি,রাঙামাটি সরকারী কলেজ।

সুপেন চাকমা

দিবে লামা

ডুবোন্দিবেল সদক
বেল ডুবোনি সাজন্য অক্তত
রাঙা বেলর চিকচিক্য সদগত,
বজি আগং গায় গায় গোরি
জুমোত মোন ঘরর ইজরত।
চেরোহিত্যে পেগো জাক
উরি যান দুর আগাজত,
চিত ন বুচ্ছে গোরি বোই আঘং
কোচপানার এই জুম ঘরত।
রিপ রিপ গোরি দেঘং মুই
রাঙা ধান ভুয়ো জুম চাপ,
কিরবে মিজেয়ে তার সনারঙে
ভরি আঘে গোদা মোনচাপ।
কানত বাজেগি নিগুজ গোরি
উবগীদ গায় কন গাবুরি,
তার সেই নোনেয়ে গীদোর সুরে
মনর ভাবনার তুবোল যায় বারিহ্।

সুপেন চাকমা

চেরেপুক

বৈজেক মাচ্ছে পুরি যিয়ে নুও জুমোত
পদনা সেরে আ গাজ কোরোদত,
অক্তে অক্তে পোরা ঘুত্তে মাধাত
ডগরজ তুই চেরেপুক ।
ত রবো শুনলি মনে হয়
তুই কত্তমান ডাঙর?
একদিন দোলে দালে চিলুং
আজলে তর কিয়ান চিগোন রবো ডাঙর।
জুমোত পদত জিয়োত পায় ডগরজ তুই
কিত্তেই তুই অনসুর জোল গরজ ?
ইক্কেদ তুই নেই কেনেই মনত পরে
আজলে তরে গম লাগিদ কধক।

.....

* সুপেন চাকমা, বিশিষ্ট কবি।

সুশীল বিকাশ চাকমা

শ্রাবক বুদ্ধ বনভান্তে নির্বানত

ও ভান্তে !
তুই গেলে নির্বানত আমারে ফেলেই অনালত
আমি এঝ বেক্কুনে পঞ্চশীল্লই বুর পারি ন' পারিই
মোজি আঘিই- পানাতি পাতাত, আদিন্না দানাত,
কামেসু মিচ্ছাচারাত, মুসাবাদাত, সূরামেরেয়য়ত
মোজি আঘিই- হিংসে-হিংসিত, রেঝা-রিচ্ছ্যাত
মোজি আঘিই- কুঁজি বস ফেলে দিয়াদিত।
মোজি আঘিই- জিনকানি পাদারী গোরি দিয়াদিত।

ও ভান্তে !
ত' দেশনাত শুননোয়ং- প্রতিরূপ দেঘর কথা
পঞ্চশীল্লোই বুর পার্চ্যা মানস্যের দ্বি সুর গোরি
ঘর তুলল্যা আদামর কথা।

ও ভান্তে !
ত' সিধু বর মাগঙর- আমি যেন্ বেক্কুনে পঞ্চশীললোই
বুর পারি ছং অহ্ধং প্রতিরূপ দেঝ গোরি পাত্তং (৩বার)
সাধু- সাধু- সাধু।

.....

* সুশীল বিকাশ চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও সদস্য, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক)।

সন্তোষ চাকমা

মনত থেব

ফগিরাছড়া যেবার পদত্ দিবুয্যা মাধান
কানফাদা রোদোত্ লাঙেল পদেদি আদি যাদে
এক্ক চিগোন গুরো লগে দেঘা–
তেহ্ পিজোর গরে আহ্মক ওই–
তুই মিধে আহ্রি?
মিধে আহ্রি মর নাঙ তুই কেনে ক'লে?
মুই তরে চিনোঙ হা....হা.... হা.....
মিলেত্তুন কামর খেয়ে হা.... হা.... হা....
ও মিধে ভেই ত' লেইবো কেনে ভরেবে চেই
হা... হা.... হা.....
মনত উধিল মর দাংগু তরুন'রে
ইধোত উধিল মর চিদ দিগোল
কোচপানার মিলেবী, ননাবি, সনাবিরে
মনত পহ্ল মর দাদা কারবায্যা।
জিত্তো আ ঠান্ডু দারে।
আনাত ভাঝি উথ্যে রজ'আহ্রি
দাদা মৃত্তিকারে-----।

.....

* সন্তোষ চাকমা, বিশিষ্ট নাট্যকর্মী ও সদস্য, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক)।

কন্না দাঁঅর

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

নআ রাদাই ডাক কারেত্তে
কুক্ কু উ ক কুক্।
চিআন্ শুনি বড় রাদাই
মাধা তুলি দআ ঝাঁড়াই
লা স্বা-গুরি ডাক্ কাইল্ল্যদে
কুক্ কু-রি ক উ ক।
নআ রাদাই য্যেন আর
গুইল্লে কুক্ কুক্।
বড় রাদাই যখন তখন
লড়াই যাইনে খুদা ধুইল্ল্য
নঅ রাদারে টুক্ টুক্ টুক্।
ইচর মাধাত্ কারবাইয্যা
বোইনে দাবা টানের,
বড় রাদার ধক্ দিহিনে
ভুদ কুড়া কাবি দিবার
তারে চিদা গরের।
ঠিক সিলকেক
চিদি আল কারবার্য্যার
এ্যান্ মেন ঘরত্তুন;
পরশু দিনা যা পুরিব
খাসানা দেআ রাচাচিঅত্-
বড় রাদা, ঠেঙা পয়সা, মদ বদল
আনা পুরিব তত্তুন।

.....

* লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার, শিক্ষক(অবঃ), রাজস্থলী।

শ্যামলাল দেববর্মা

ককলব কবগ' আন'

ককলব কবগ' আন'
সিরিঙ সরপ গারিং বিসিংগ
বয়ার কীচাং চাতীতীই
কক তেনেনে সালায়না।

অর' বাহায় বুজাগ'
তঙথায় সীনামনাই রগনি
জালাই বখকগীই
চুচাই-গানথালীঙ তানপরনাই খা কীরাকরগনি
সামপিলি মীসাঅ অর'
কিয়া হা সীনামবাই কেপলেনাইরগনি
ককলবব' সাজাগ' মর' মর'।

কবলব কলকসে অম'
আরব্যরজনিনি সাই কথমাতীই
থাইসা থাগীই তেই থাইসা
কিয়া তেই থাইসাথ–
সেপলেজাকমা নরজাকমানি
হাপলক চুকসাঅ নখান' তাঙনানি
তাই বনি বাগীই-ন
মীকতীয় য়রখীলায়মা উল'
সিচাঅ য়াচাকনা রীচাপমুঙ।

.....

* শ্যামলাল দেববর্মা, কবি, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত।

চন্দ্র কান্ত মুড়াসিং

আনি নগ'

মাইনি বাগীই কাপলিয়া আঙ
নখা নায়সাই তঙগ,
থা বলঙনি হা নায়তুগীই
বরীই তঙগ নাগীই।

রি কাননানি খাতুংলিয়া
রি নুগখে-ন কিরিঅ
পুলিসনি রি চুমুই কায়ী
বরক তানথারনাইরগ;
সাক বুকচা সে কাহাম তঙমানি।

কক সালিয়া নক তাঙনানি
বীরীয় বীসা খেবীই খারীই লেংখা
সাল সাতকখা সাল' ফায়ীই
হর' থুফায়ী হরনি মীনাক
আনি খাপাংনি নগ'।

.....

* চন্দ্র কান্ত মুড়াসিং, কবি, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত।

গল্প

চাঙমা কিত্যে

চিত্র মোহন চাকমা

যক্ষা বাবর বর ঘুম

ইক্ষে জুরাছড়ি উপজেলাত জুরাছড়ি মৌজাত আগেদি যক্ষা নাঙে একজন মানুষ এল-অ, 'পুয়া' নাঙে তারে যক্ষাবাপ ডাগন। তে চিগনত্তুন ধরি ফিবিলিঙ্যা এল-অ। নিত্য চলান্যা কধা কয়। মনত দুগ হলে পিউ-পিউ শিক কারে, কুনকুনায়। তাত্তুন ধান ভুই, পাউন্ডি ভুই আগে। সময় সময় জুম গরে। এক বঝর শামুকছড়ি বামত ৫/৬ গিরছ মিলি জুম খেয়ন্দই। সুধা ঘচ্যা তুলা অক্তত্ তারার এক্কুয়া এঙলি কুগুরে কামর খেলে চেরবুয়া নে পাঁচসুয়া চ পুদেইয়্যে। জেরেদি সেউন এক্কুয়া খক্যা বাঘে সুপ পেই রেদ কদুর অহ্লে এই এক্কুয়া কুগুর-চ নেযায়। দিবা নি নেই একদিনে মাত্যা (যক্ষাবাবে) রেদ বুন্দুক উক্ক লই বাঘয়ারে খাপ দি রইয়ে। রেত্ কদ্দুর অহ্ই খক্যা বাঘকুয়া এই কুগুর-চ নেযাতে সিয়ানত বুন্দুক মরি কুগুর-চ বুয়া নি-নবারে। তার কেল্যা বেন্যা ৪/৫ জন মিলি বাঘকুয়া তগা যেইয়ন। কদ্দুর যেই এক্কান ছরাত খাব' উগুরি সুপ পেইয়ন্দই। বাঘকুয়াই এক জনরে ঝাবেই কারি লদে মাত্যালই বাঘকুয়া ধরাধরি গোরি মাত্যা কানান কাড়ি দিয়ে। গম হই দলামঝা ওইয়্যে। সেনত্যেই তারে দলাকানায়্য ডাগন।

কয় বঝর দুঃখকাম গোরি বুর' পাগত পরি পুয়ারে ঘরি গিরিত্তি গজেই দিনেই, তারা দ্বি নেক মোগে সুবলং খাগড়াছড়ি বাজারত দগান দিয়ন্দই। যক্ষাবাপে বেপারীত্তুন মাল লই বেজাকিনা গরন। সেক্ষে বুধবারে হাট বজে। বাজার দিনে মোষ এহ্রা শুগর এহ্রা বেজন্দি। তে-নিত্য কিনি রাগায়। সদ্যা-মু- বানা ভাত খেই নবারে একসের এহ্রা ললে দ্বিজনে দ্বি-তিন দিন খান। এঙোরি থাক্ষে থাক্ষে এক বঝর তা মোক্কুয়া এক দিন্যা পত্যা উধি ছেই ফেলেই আগুন জ্বালি গাঙত যেইয়্যে। সিত্তুন এই চায়দ্যে তা নেক্কুয়া (মাত্যা) ঘুমত্তুন ন-উধে। মনে মনে কয়দ্যে তে-দো এদধন ঘুম ন-যায় এয্যা কি এধক্ষন পরি আঘে? জেরেদি জাগেই চেলগোই, নেই ন' জাগে থান ন' পায়। ঝাগেরেই চেল–অ, ন-জাগে, চোখ খাদি থায়। কানক্ষন বাদে তা মোক্কুয়াই ডাগেদি আগন্দে দগানর মানুষ্যনরে কলগই। ৪/৫ জন এই চান্দে চোখ খাদি আগে জাগেলেয়্য ন' জাগে। থান-নপার। জেরেদি আদামত তা-পুয়ালগরে খবর দিলাক। সিত্তুন আদাম্যা ৪/৫ জন এই ধরাধচ্যা গোরি ঘরত নিলাক। দগানত্তুন তারা ঘর মেল-মুল দুরত ওই পারে। সিদু নিনেই অঝা বৈদ্য ধরি ডালিবাজা দিনেই চাগুরী গল্যাক। ৪/৫ জন বৈদ্য দারু দি-চেলাক, নেই কিচ্ছুয়্যে গম ন' অহ্ল জেরেদি ডেনচিল্যাবুয়া ছনময্যা ওই লারিচারি নবারে। কধা কধেয়্য লেবেরা জেবেরা

ওইয়্যে। ঘর উদনত তারার ধান ঘর আগেদে সিয়দ জুদ' গেরি থান্। সিদু তা নেক যক্ষামা মালিশ তেল মাজি-দে। সে জেরেদি চঙরা মগজ, বরাশুগরর তেল, যাতুন জিয়ান শুনন গুরি দি-চেলাক। নেই কন' দারুয়্যে ন-ধরে। কন বাবদে খচ্যেই খচ্যেই উদনত নিঘিলিপারে। সিদু বাংআহ্ধে-দি চোরুন ধরা এক্কুয়া ধরি যেদ্দুর লাগ পায় সিয়ানি চুরি ফেলায়। মানুষ দেলে কধা কধ চায়, কই নবারে। বানা এক্কা উক্ষয়া র'গোরি পারেদে। কয় বঝর সং বেচারা সেঙেরি ১৯৫৮ ইংরেজীত গাছ কাটিং অভার আগেদি গায় গায় অক্তে অক্তে ডাঙর ডাঙর র' গুরি টেঙা, টেঙা, টেঙা কইয়্যেদে। থে জেরেদি কইয়্যেদে আর সাগর সাগর সাগর। যে শুনে তে কয় সিয়ানি কি কয়? এঙেরি নিত্য কয়। মাস দি মাস বাদে তে মরি যেই যেক্ষে গাছ কাটিং অহ্ল' সেক্ষে টেঙা ঝর পরে পারা পছ্যন। এক্ষুয়া আন্দাচ্যা গুরত্তুন-অ শতি নোট দেগে। এক ফুট্যা গাছ এক্ষুয়া কাবিলে ৪ (চের) আনা পায়। জেরেদি দ্বি-আনা। সে পরেদি ১৯৬১ ইংরেজীত কাপ্তেই গধায়ান বনগুরি ১২০ ফুদর তলেদি ডুবেই সাগর' ধক্যা দেঘে। জেরেদি যক্ষাবাবে টেঙা সাগর কধে যে শুন্যে তে ভাবি চায়দ্যে এইয়ানি ন আগাম কধা কইয়্যে দে।

.....

* চিত্র মোহন চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার , বনযোগীছড়া, জুর'ছড়ি।

চিক্কোবীর জিদ

ভাঝ বদলঃ ভিএন চাঙমা

চিক্কোবী কা-অক্ষর ন'জান্যে উক্ক মুরুকখ' মিলে। তা নাঙানও তে লেঘি ন' জানে। চিক্কোবী নেক্ ছদকবাবু বরআদাম' হেডম্যান; হালিক তে আগেন্দি এল'দে উক্ক উজুসুরুং চাষবাস গোরি খেইয়্যা মানুজ। পাচ্চ্যু বঝর শহরত থেনেই তে বানা নিজ' নাঙান নয় আর' ভালক্কানি শিক্খে। ইক্কুনু তে তা মুরুক্খ' মোক্করে নিনেই ভজমান লাজায়।

'রাঙা মা, ত' নিজ' নাঙ লেঘানা শিঘি ল'না দরকার। ম' নাঙান বানা দ্বি- অহ্রখর। তুও তুই লিঘি ন' জানস। আমক অভার!' চিক্কোবীরে তে অত্তে অত্তে কধ'।

চিক্কোবী তা কধায়ানি আহ্ঝিনেই উরেই দিদ'। 'রাঙা বাপ, ইক্কুনু আ ইয়ানি শিঘিনেই কি ফাইদে অভ'? ম' আঙুলুন থদর' ওই যাদনধোই। মুই কিত্তেই ঐ অহ্রখকুন লিঘিবার চেম? গাবুজ্যেউন শিঘোদোক। এ বুর' কাল্ল্যেত মুই যে ধোক্যেন সে ধোক্যেন থেম।'
ছদকবাবু কাম্ম বন্দ সেনত্যা তা মোক' পিজেন্দি তে আ অক্তয়ান বরবাদ গোরি ন' পারে। তে শিরে বিজিনেই কবার চেল'দে- 'ওহ্ রাঙা মা, রাঙা মা, কি কচ্ছ্যে তুই সিয়েনি!' হালিক তে কিচ্ছু ন' কোইনেই জুর' গোরি থেল'।

একদিন্যে ছদকবাবু উক্ক লিত্তিং বই ঘরত আনিল'। তে কল', 'রাঙা মা চাদে, লেঘা শিঘিবাত্তেই চাঙমা আগপুদির উক্ক বই। আমা নাদিন-পুদিনোনত্তুন কামত লাগিব'।'

একদিন্যে চিক্কোবী রাঙা বাবর উক্ক কোগোই সিলেই দের। কোগোইব' আহ্ধর সিলেনিয়ান ফুগেই যেইয়্যা। চিক্কোবী পিরেয়ানত বৈ সুচ্চু লল'। কোগোইব' জেব' ভিদিরে আহ্ধ দিনেই হঝক হঝক গরেত্তে সান পেনেই রাঙা মা তেঙা পারা পেল'। ফুঘেইনে চাইদে এক্কান চিদি। উক্ক লেবগা ভিদিরে দোল বিরবিচ্যে চিদি, চিগন-চাগন গুরিং আহ্ধর লেঘা আ কাবোজচানত্তুন তুমবাচও নিঘিলের। কাবোজচান দেঘি চিক্কোবীর পরান চিগুদ গোরি উদিল'।

রাঙা বাবে কি লুগর ম' ইধু? তে কি লেঘা পারিয়ে মিলেউনদোই লাঙপাদা দিয়েন সিয়েন গরের? তা নাধা আ মুরুক্খ' মোক্করে রজনা গরের? তে চিদে গরিল'।

চিক্কোবী লেবগায়ান খুলিনেই চিদিয়ান নিঘিলেল'। হালিক মুরুক্খ' কিনে উক্ক অহ্রকও ন' বুঝিল'। জিংকানিত পল্ল্যেবার লেঘা মাদে ন' জানে কেনে চিক্কোবী মন' দুগ পেল।

চিক্কোবী জিদ গোরি ভাবিল'- মত্তুন জানা পরিব' চিদিয়ানত কি লেঘা আঘে? হয়ত' ম'গোদা জিংকানিয়েন বদোলি যেই পারে, মুই আর' আদামত ফিরি যেম, জুমত কাম গরিম। রাঙা মা কানা ধল্ল্য' আ ভাবিল'- ইরুক রাঙা বাবে বদোলি যেইয়্যা, নিত্য তে তা দাড়িয়ান বিরবিচ্যে

গোরি মুরয়। চিক্কোবী চিদিয়ান' সেনদি চেই থায় আ পিরে পেইয়্যা শুগুর' ধক্ক্যেন কিজেক দে। পড়ি ন' পারিল' তে চিদিয়েন, আ কার'রে ইয়েন দেঘানাও ধ' লাজ গরে পারা।

রাঙা মা চিদিয়েন সন্দুগত লুগেই থল'। কোগোইব' সিলানা থুম গরি রাঙা বাবরে বাচ্চ্যেই থেল'। হালিক রাঙা বাবে যেক্কে ঘরত ফিরিল' রাঙা মা তারে কিচ্ছু পুঝোর ন' গোরিল'। লক্খী গরি তে তা নেক্কু লঘে কধা কল', লেঘা শিগিবাত্যেই আওজ দেগেল', মুরুক্খ' জুম্ম ওই থাদে তাত্তুন আর গম ন' লাগের সিয়েন তে ইজেরানদি বুঝেল'। রাঙা বাবে সিয়েন শুনিনে খুঝি অল' ভজমান। 'গম ওইয়্যা, মুই তরে শিগেম।' তে কল'। রাঙা বাবর বিরবিচ্যে গরি মুরিয়ে' মুয়ান কিত্যে চেইনে রাঙা মা কল' 'ঠিগ আগে, ফাঙ গর্ ।'

দ্বি-মাজ ধরি চিক্কোবী নিত্য লেঘা শিগিল'। ধোরযো ধরি অহ্রকখুন ফারক গোরিল', এগত্তর গোরিল', ভায জরেল'। নিত্য সাজন্যা মাধান সন্দুক্কুত্তুন সে চিদিয়ান নিঘিলেই কি লেঘা আঘে লুগেনেই পরিবের চেরেত্থা গোরিধ'। হালিক সিয়েন ধ' তাত্তেই হেলার কাম ন' এল।

তিন মাস পরে চিক্কোবী লেঘা মাধে পারে, লেঘিও পারে। একদিন বেন্যামাধান রাঙা বাবে যেক্কে কামত যেইয়্যা রাঙা মা সন্দুক্কুত্তুন চিদিয়েন নিঘিহ্লেই মাধানা ধল্ল্য। চিদিয়ানর গুরিং গুরিং আহ্ধর লেঘা মাদাদে চিক্কোবীর ভারি কস্ত' অয়, হালিক কাবোজচান' তুমবাচ্চানে তারে উচ্ছ্য তুলি দে। চিদিয়েন রাঙা বাব'রে উধিজ গরি লেঘা। চিক্কোবী চিদিয়েন মাদেল'-

দাঙ্গু ছদকবাবু,

তরে যে অঝাপাত' বইব' পাধেবার কধা দিওঙ সে বইব' পাধেলুঙ। মত্তুন মনে অয় ত' মোক রাঙা মা নিজ' অহ্রকখুন শিঘানা দ্বি-তিন মাঝে তা আহ্নজামে আনি পারিব'। মরে কধা দে তুই ত' সমারিরে লেঘা মাদেই পারে পারা বল দিবে। তারে বুঝিবাত্যেই দে মুরুক্খ'ওই থানা কেজান্যান দুঘোর। জাত্তো যেনে লেঘা পরায় উজে যেই পারে সিয়েনত্যেই আমি বেহ্ক যুক্কল গোরির। হালিক আমা কায়-কুরে মানুচ্ছুন' কধা আমি হাক্কে পুরিহ্ ফেলেয়োই। ছদকবাবু, হামাক্কাই ত' দায়িত্বয়ান উভেবে।
থুমেদি

ত' সমাজ্যে কমলাদেবী
চিক্কোবী চিদিয়েন দ্বি-পল্ল্যা পরিল'- মুরে মুরে এক বাব'দর অগমান লাগি উদিল' তা নিজ' উগুরে।

(রাশিয়ার নাঙ করা লেঘিয়্যা মিখাইল জোশেনকো'র 'রেলাগেয়া' নাঙে উক্ক গল্পর অবলম্বনে লিখ্যা)

.....

* ভিএন চাঙমা, নবীন লেখক ।

রনজিৎ দেওয়ান

"আমার হাইজ্যাক হওয়া গান।"

মনীষিরা বলেছেন মানুষ নাকি সৃষ্টির সেরা জীব। তাদের মধ্যে ভালো মন্দ কুশল অকুশল, সুখ, দুঃখ, বোধশক্তি প্রখরভাবে রয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। আসলে বাস্ত্মবে সব মানুষের মধ্যে বোধশক্তি থাকলেও বিবেক বোধ এবং মানবতার মান দন্ডে স্থাপিত উদার মনোভাব ও সৎ মানসিকতা রয়েছে কি? আমি মনে করি নিশ্চয়ই না। প্রায় এক দশক আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি ধারাবাহিক নাটক প্রচারিত হয়। নাম ছিল "বার রকমের মানুষ"। ঐ নাটকে পেশাগত এবং দৃষ্টি ভঙ্গির ভিন্নতার মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার প্রয়াস ছিল। কিন্তু বাস্ত্মবে শুধু কি বার রকমের মানুষ রয়েছে এই পৃথিবীতে? আমার মতে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ কিন্তু শুধুমাত্র বার রকমের নয়, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্ত্মাধারা অনুযায়ী যত জন তত রকমের মানুষ পৃথিবীতে বাস করছে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বে তথ্য অনুযায়ী সাতশত কোটির উপর রকমের মানুষ আছে। আমার এই প্রবন্ধের নাম কেন এমন রাখলাম সম্মানিত পাঠক বৃন্দ প্রবন্ধটি পাঠ করলে তা সহজে অনুধাবন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি। আমার সৃষ্টি করা যত গান রয়েছে তার মধ্যে নিম্নে লিখিত দেশাত্ববোধক গানটি ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে রচনা ও সুর করেছিলাম। তখনকার সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেছিলাম যা এখনো করে থাকি। গানের আঙ্গিক অনুসারে মূলত এটিকে গান না বলে গীতিকবিতা বলা যায়। এই গীতিকবিতাটিতে আমাদের আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনধারা ও প্রকৃতিকে নিয়ে মেলবন্ধনের চিত্র আঁকার চেষ্টা করছি। অবশ্য সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য।
গীতি কবিতাটি নিম্নরূপঃ-

আমা দেচ্ছান মুরমুরি গাঙে ছড়ায় ভরা
আমা দেচ্ছান সাগর মানস্যর সাগর আঝায় গড়া
আমা দেচ্ছান হিরে মানেক সনায় রূবয় ভরা।
নানান জাদর মানেই আঘন নানা বাঝায় মা দাগন
নানান ভাঝায় কধা কন তারা
আমা দেচ্ছান ..... সনায় রূবয় ভরা।
বেন্যে অলে পুগহ কিত্যে মোনো মাধানদি রাঙা বেলান উধে
সেই রাঙা বেলঅ পহ্রত আমা দেজঅ বুগত

কাম্মুঅ ভেইয়ে কাম গরন পোরবোঅ ভেইয়ে বই পড়ন
গাজে গাজে পেক দাগন নানা রঙর ফুল ফুদন
কালা কালা ভঙরা মুঅত ভাজেই গীদ ধারা
ফুত্যে ফুলঅ মধুনি খেইনে গরন সারা
আমা দেচ্ছান..... সনায় রূবয় ভরা।
বেল্যে অলে বেলান যায় আমা দেঝত সাঝ্ ঘনায়
সেই লেক্ষ্যেনে আমা মা বোন ঘরে ঘরে বাত্তি দুঅন
ঘরত ফিরন কাম্মুঅগুন।
ওলি ওলি ওলি বাজক পাদা ঝুলি
সনা চিজি ঘুমন যা ধুলোনানত পরি
আয় আয় চান আয় আয় তারা
লক্ষ্মী মাবুঅ ওলি দাগি পুঅ বুঅ ঘুম নেয়
এঝান দেচ্ছান কন কিত্যে আর দ ন দেবং
এঝান দেজআর কন কিত্যে তোগেই ন পেবং
এ দেচ্ছান ওক এ পিত্তিমিত দোলর বেগর সেরা
আমা দেচ্ছান ..... সনায় রূবয় ভরা।

এই গীতি কবিতাটি তখনকার সময়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানে গাইলে তা শুনে রাঙ্গামাটি উপ-জাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর প্রাক্তন পরিচালক মি: সুগত চাকমা (ননা ধন) এতই পছন্দ করেন যে, তখনকার সময়ে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত "লিটল সাহিত্য ম্যাগাজিন জুভাপ্রদয় (জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর)" ছাপানোর জন্য আমার কাছ থেকে চেয়ে নেন। আমিও সরল বিশ্বাসে তাঁকে দিই এবং ম্যাগাজিন ছাপান। বর্তমানে উক্ত ইনস্টিটিউট এর গ্রন্থাগারে ম্যাগাজিনটি রয়েছে বলে জানা গেছে। সম্ভবত এটি ১৯৭৬ইং সালের ঘটনা। কিন্তু তিনি কখনোই আমাকে সৌজন্য স্বরূপ একটি কপিও দেননি। অনুমান হয় আমার এ গীতি কবিতাটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও আমার গীতি কবিতাটির আদলে একটি গান রচনা করেনে যা কুমার নন্দিত রায় এর (রেনি বাবু) শালিকা আল্পনা চাকমা (মিন্টুনি) ৭/৮ বছর আগে একক অডিও ক্যাসেটে এ গানটি গেয়েছেন। এটি ঢাকা থেকে প্রকাশ করা হয়।
গানটি নিচে দেওয়া হলোঃ-

আমা দেচ্ছান মুর মুরি গাঙে ছড়ায় ভরা
আমা দেচ্ছান সাগর মানয্যর সাগর আঝায় গড়া

আমা দেচ্ছান হিরে মানেক সনায় রূবয় ভরা।
নানান জাদর মানেই আঘন নানান ভাঝায় মা দাগন
নানান ধগে দিন কাদেই যান তারা
আমা দেচ্ছান ..... সনায় রূবয় ভরা।
বেন্যে অলে বেলঅ পহ্রে সনার হাজি ঝরে
রেত্তো এলে জুন জহ্রে মেইয়েয় বুক ভরে
আমা দেচ্ছান .....সনায় রূবয় ভরা।
ওলি ওলি ওলি বাজক পাদা ঝুলি
সনা চিজি ঘুমন যা ধুলোনানত পরি
এঝান দেচ্ছান কন কিত্যে আর দ ন দেবং
এঝান দেজআর কন কিত্যে তোগেই ন পেবং
এ দেচ্ছান ওক মর দিচোগোত দোলোর বেগর সেরা।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ আপনারাই যাচাই করুন কে কার গানের ভাবধারা, অর্থ, শব্দ, জীবন চিত্র ধার করেছে, প্রভাবিত হয়েছে? এমনকি আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন চিত্র কার লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে? কোন কবি সাহিত্যিক বা শিল্পীর সৃষ্টি সম্ভার দ্বারা কোন ভক্ত বা ব্যক্তি প্রভাবিত হতেই পারে এতে দোষনীয় কিছু নয়। কিন্তু কোন ভদ্র লোক দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি ডিগ্রি লাভের পর উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সর্বোচ্চ পদ মর্যাদা পরিচালক পদে আসীন থেকে স্বজাতি ব্যক্তির সৃষ্টি নিজের নামে চালিয়ে দেয় বা প্রকাশ করে তাকে কি নামে অভিহিত করা যায়? প্রিয় পাঠক বৃন্দ বিষয়টা খোলাসা করা যাক-১৯৭৫ইং সালে আমার রচিত উপরে উল্লেখিত গীতি কবিতাটি ২০১১ইং সালে বর্তমান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ইনস্টিটিউট থেকে "পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নির্বাচিত গান-১ম খন্ড" বইটি প্রকাশ করা হয়। ঐ বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় আমার লেখা গীতি কবিতাটি মি: সুগত চাকমা ননা ধন তার রচনা হিসাবে প্রকাশ করেন। একজন উচ্চ শিক্ষিত দায়ীত্বশীল ভদ্র লোকের পক্ষে এমন গর্হিত কাজ করা কি শোভনীয়? সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে কি নিন্দনীয় নয়? বিষয়টা জানতে পারলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মকর্তা মি: শুভ্রজ্যোতি চাকমা এর সাথে যোগাযোগ করি এবং মৌখিকভাবে আমার যুক্তি ও তথ্য জানালে তিনিও একমত পোষণ করেন যে গানটি আমারই রচিত। এক পর্যায়ে মি: শুভ্রজ্যোতি চাকমা মি: সুগত চাকমা ননা ধনের নিকট বিষয়টা উত্থাপন করলে নাকি উত্তর দেন এভাবে "এরকম গান দুটো আছে" রনজিৎ বাবুর একটা, আমার একটা।" এই তথ্যটি জানতে পারি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন

সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মি: প্রসন্ন কান্তি চাকমা এর নিকট। প্রসন্ন বাবু সুগত চাকমা এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি (সুগত) এই উত্তর দেন। তাই যদি হয় তাহলে সুগত বাবু আমার রচিত গীতি কবিতাটি তাঁর নামে ছাপালেন কেন? শুধু তাই নয় গতকাল ০৮/০৩/২০১৪ইং শনিবার তারিখে রাত্রে ননাধন বাবু রচিত গানের মূল শিল্পী আলপনা চাকমা মিন্টুনীর সাথে মোবাইলে কথা বলে জানা যায় যে, অনেক বছর আগে ননাধন বাবু আলপনাদের বাসায় আমার গানের আদলে লেখা তাঁর গানটি শিল্পীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। গানের সুরটি কিন্তু ৯০% আমার দেওয়া সুর। একজন উচ্চ শিক্ষিত দায়িত্বশীল ভদ্র লোকের (যিনি আদিবাসী সাহিত্য চর্চা করেন) এহেন মনোবৃত্তিকে কোন নামে অভিহিত করা যায়? এ যেন টেস্ট টিউবে জন্ম দেওয়া বিকৃত নিজের সন্তানকে অস্বীকার করে অপর জনের হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সুন্দর ছেলেকে চুরি করে নিজের বলে দাবি করার সামিল নয় কি? দেশ জাতি সমাজকে অকৃত্রিম ভালোবেসে হৃদয়ভূমিতে চেতনার আলোয় সিক্ত করে সঙ্গীতের সুরের বীজ বুনে চলেছি এখনো। তা যদি তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত সাহিত্যসেবী ভদ্র লোক আমার প্রিয় সৃষ্টি সম্ভারকে হীনমনোবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে চুরি (হাইজ্যাক) করেন তিনি বিশ্বের সাতশত কোটি রকমের মানুষের মধ্যে "কোন রকমের মানুষ" হিসেবে গণ্য হবেন? যাঁর বিবেকবোধ এবং মানবতার মানদন্ডে স্থাপিত উদার মনোভাব ও সৎ মানসিকতা থাকা নিয়ে সন্দেহ বা প্রশ্ন অবশ্যই করা যেতে পারে। প্রিয় পাঠক বৃন্দ উক্ত আদিবাসী গানের বইটিতে আমার রচিত গীতি কবিতাটির মিথ্যে তথ্য দিয়ে নকল দাবিদার হয়েছেন তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে আসল এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনাদের অবগত করলাম। আপনারাই বিবেকবোধ, উদার মনোভাব এবং সৎ মানসিকতা দিয়ে এর বিচার করবেন এই প্রত্যাশা রাখলাম।

০৯/০৩/২০১৪ইং

.....

* রনজিৎ দেওয়ান, বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী, শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়(অবঃ)।

দেবাশীষ রায়

কালিন্দিঃ চাকমা রাণী (একটি সত্য কাহিনী)

(ইংরেজি থেকে অনূদিতঃ পাপেল চাকমা)

চাকমাদের বড়ো আকারের বসতিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে কতুকছড়ি গ্রাম রাঙ্গামাটি জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি প্রধান সড়কের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা কিছু নীচু পাহাড়গুলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে যেগুলো ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে ধাবিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় যখন পাহাড়গুলো কিংবদন্তি ফুরামন পাহাড়ের, স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাসানুসারে পরী এবং প্রেতাত্মাদের আবাসস্থল, পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়েছে। নিকটবর্তী একটি জলস্রোত প্রবাহিত হয় গ্রামখানির মত একই নাম ধারণ করে, যেটি কর্ণফুলির সাথে মিলিত হয়েছে মানিকছড়ির নিকটে। বর্তমানে গ্রামটি নানাবিধ কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ যেমন সেখানে স্কুল, ধান ভানার মেশিন রয়েছে, এবং মাঝে-মধ্যে বিদেশী এবং শহরাঞ্চলের দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে (সেখানে) চাকমা জনসাধারণ কিভাবে বসবাস করে সেটি দেখতে। অবিলম্বে সেখানে বিদ্যুৎ এবং কৃত্রিম উপগ্রহ সাহায্যে সম্প্রসারিত (স্যাটেলাইট) টেলিভিশন খুব সম্ভব দেখা মিলবে। তবে জীবনযাত্রা অনেকখানি অন্য রকমের ছিল এমনকি কয়েক দশক আগেও। অপরদিকে এমনকি তারও অনেক আগে, উনিশ শতকের শুরুর দিকে ফিরে দেখা যাক, যখন ইহা ছিল জুম চাষীদের একটি শান্তিপূর্ণ নীরব গ্রাম।

এই গ্রামে বাস করত শক্তসবল এবং হাসিখুশি মনোভাব সম্পন্ন একজন আমুদে চাষী যাকে, তার বৃদ্ধ বয়সে, "গুজাং বুজ্যা"; কুঁজো বুড়ো লোক নামে অভিহিত করা হত তার সম্মুখদিকে ঝুঁকে পড়া দেহের কারণবশতঃ। গুজাং তার প্রথম সন্তান কালাবিকে (অর্থ-কালো মেয়ে) ভালবাসত যেহেতু সে হচ্ছে একমাত্র সন্তান যতক্ষণ না পর্যন্ত বহু বছর পরে যখন তার ভাই জয় মুনি এই পৃথিবীতে আসে।

কালাবির পছন্দের খেলনা ছিল ফড়িং। গুজাং একটাকে ধরত এবং ইহার লেজের সাথে এক লম্বা শর বেঁধে দিত যখন কালাবি অন্য প্রান্তে ধরত তার নাদুশনুদুশ আঙ্গুলগুলো দিয়ে এবং তাদের সম্মুখভাগের ছোট উঠানের চতুর্পাশে দৌড়াত, সাথে ফড়িং উন্মত্তভাবে তার ডানাগুলো পতপত করে ওড়াত কালাবির সাথে সমানে চলতে একই গতিতে। তবে কালাবি ছিল মনেপ্রাণে একজন কোমল-স্বভাবের মেয়ে এবং সে খেলার পরে এই অসহায় প্রাণীদের ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বোধ করত নিঃসন্দেহে বিমূঢ় এবং শ্রান্ত, কিন্তু সম্পূর্ণ জীবিত এবং সুস্থ থাকত।

কালাবি তার বাবার সাথে নিকটবর্তী বনের ধারে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত। ইহা ছিল ফড়িং ওড়ানোর চাইতে রোমাঞ্চকর তার কাছে। মাঝেমধ্যে এই দুইজন পরস্পর

প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত কে বেশী বাঁশ কুরুল, বুনো ছত্রাক, অথবা কাঁকরা এবং চিংড়ি মাছ সংগ্রহ করতে পারে বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ঝিরিতে। গুজাং সবসময় হেরে যেত, এবং সে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ঐটি করেনি। কালাবি ছিল অপেক্ষাকৃত অধিকতর দক্ষ এবং তার হাত দুটো ছিল অধিকতর চটপটে। মাঝেমধ্যে কালাবি তার বাবার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হত বিশেষ কোন উদ্ভিদ অথবা গাছড়া বা ফুল যেগুলো সে নিজে আবিষ্কার করত সেগুলো শনাক্ত করার বিষয়কে কেন্দ্র করে। সে কখনো কোন বন্য প্রাণীকে ভয় পেত না, এবং সে অনেক পাখি, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য পশুপাখি, এবং লতা-গুল্মের নাম বলতে পারত। একদিন কোন এক উপলক্ষে দু'জনে তারা তাদের রেওয়াজ-মাফিক ভ্রমণে বের হল, কালাবি কিছু অদ্ভুদ আকৃতির ফুল তার বাবাকে দেখিয়ে দিল। গুজাং খুবই খুশি হল যখন সে এগুলো দেখল এবং চিৎকার দিয়ে বলে উঠল যে এগুলো ছিল ঘিলা ফুল। সে সাময়িক উন্মাদনাগ্রস্ত্ব হয়ে কিছু চয়ন করল এবং গ্রামের দিকে তাড়াহুড়া করে যেতে লাগল, সম্পূর্ণরূপে বেমালুম তার কন্যাকে ভুলে গিয়ে। হাঁপানো কালাবি অনুসরণ করতে থাকল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হল।

গ্রামের সীমানার কাছাকাছি যে মাত্রই পৌঁছল, গুজাং হঠাৎ উপলব্দি করল যে তার এমনকি একটি ফুল বা পাপড়িও আধা-মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে নেই। সে অবশ্যই এগুলো তার তাড়াহুড়া এবং উত্তেজনার মধ্যে ফেলেছে, সে ভাবল। সে তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে পুনরায় ফিরে গেল এবং মাটির উপরে সেগুলো খুঁজতে চেষ্টা করল, কিন্তু ফুলগুলো ছিল আকারে খুবই ছোট, এবং সম্ভবত পতিত পাতার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল যেগুলোর উপর দিয়ে কালাবি আধেক হাঁটা আর আধেক দৌঁড়ানো সময় মাড়িয়ে চলে গিয়েছিল তার দ্রুত চলা বাবার অব্যবহিত পরে। যতই সে চেষ্টা করুক না কেন, গুজাং খুঁজে পেল না লতাটি, এমনকি কালাবি সাহায্যে, কারণ তারা তাদের রাস্ত্মা হারিয়ে ফেলেছিল। হতাশ হয়ে গুজাং বাড়িতে ফিরে আসল, সবেমাত্র কালাবির নানা প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে, কালাবি তার পিছে পিছে চলল।

পরবর্তী কিছুদিন সেখানে প্রচন্ড বৃষ্টি হল। বৃষ্টির পর গুজাং আবার আগের জায়গাটিতে গেল, যেখানে ভেবেছিল সে ঘিলা ফুল দেখেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। অধিকাংশ গ্রামবাসী ইহা বিশ্বাস করল না যখন তারা এ ব্যাপারে শুনল কারণ কেহ কোন দিন ঘিলা লতার ফুল দেখেছে বলে অদ্যাবধি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যার খোসা দিয়ে খেলা, খেলা হয়ে থাকে। আর যে কয়েকজন যারা তাকে সচরাচর বিশ্বাস করত কারণ সে ছিল একজন সত্যপরায়ণ এবং অকপটে মানুষ, তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে, তবে তারা সবাই একমত ছিল যে গুজাং এর পরিবার কিছু একটা অপ্রত্যাশিত ধন সম্পদের অধিকারী হবে। ইহা কারণ একটা চাকমা পুরনো প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যে কেউ ঘিলা ফুল দেখুক না কেন সে খুবই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। গ্রামের তান্ত্রিক (বৈদ্য) যিনি

অত্যন্ত্ম শ্রদ্ধাবান এবং ভীতিকর পাত্র ছিলেন ভবিষ্যতবাণী করলেন যে কালাবি একদিন রাজমহিষী হবে। সাধারণভাবে [চিন্ত্মা বা কল্পনা অপেক্ষা] কর্মে দক্ষ গুজাং জানতো না কি বিশ্বাস করবে। দশ বৎসরের কালাবি এসব কিছু ব্যাপারে একটু একটু আনন্দ অনুভব করল যদিও সে পুরোপুরিভাবে জানত না এসব অযথা হৈচৈ করার পেছনে কি রহস্য ছিল।

যখন সময় অতিবাহিত হতে লাগল কালাবি এক সময়ে একজন লাবণ্যময়ী যুবতী নারী হয়ে ওঠল এবং ঘিলাকে কেন্দ্র করে মনোরম কাহিনীটি প্রায় ভুলে গেল। প্রায় তেমন কিছু ঘটতো না কতুকছড়িতে তাদের সরল অনাড়ম্বর গ্রামীন এবং প্রায় অপরিবর্তনশীল জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করতে। তখনকার সময়ে সেখানে কোন বিদ্যালয় ছিল না গ্রামে, যার কারণে কালাবি তার পিতামাতা ও ভাইকে তাদের প্রাত্যহিক টুকিটাকি কাজে সাহায্য করত। সে তাদের সবজির ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কার করত, জুমের ক্ষেতে পাখিদের তাড়িয়ে দিতে নানা ধরনের কাকতাড়ুয়া তৈরী করত, এবং বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি সংগ্রহ করত। সে আরও নিকটবর্তী নদী থেকে পানি নিয়ে আসত অন্তত্মতঃপক্ষে প্রতিদিন সকাল ও বিকালে দু'বার করে। অন্য সময়ে, সে পিনোন (skirts-ঘাগরা), শাল, মোটা কাপড় (blankets), অথবা নানা ধরনের কারুকাজ করা অন্যান্য কাপড় বুনত। তার পছন্দের শিল্পকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বুনো বেগুন(ফুল) (aubergine) এবং হাতির নকশা।

চাকমাদের রাজধানী রাজানগর কতুকছড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। একজন স্বাস্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে কতুকছড়ি থেকে রাজানগর হেঁটে যেতে দিনের অর্ধেকের চাইতেও বেশি সময় লেগে যেত। শুধুমাত্র হাতে গোনা দু'একজন গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে এযাবৎ সেখানে ভ্রমণ করেছিল। অপরদিকে যারা সেখানে গিয়েছিল রাজার মুগ্ধকর রাজপ্রাসাদ, বৌদ্ধমন্দির, অগণিত পদ্মপুকুর এবং রাজার হাতিপাল এবং ঘোড়াসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে সকলের মুখেই নানা ধরনের গল্প শোনা যেত। সেই সময়ে সর্বশেষ স্বাধীন চাকমা শাসনকর্তা রাজা ধরম বক্স খাঁ ছিলেন রাজা। ধরমকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের জনশ্রুতি রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যগুলোর মধ্যে একটি হল তাঁর মাতার এক ভ্রমণ যে সময়ে ধরম ছিলেন গর্ভে। ইহা কথিত আছে যে পথিমধ্যে রাণী খুবই ক্লান্ত্ম হয়ে পড়লেন এবং বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন যদিও সেখানে ছিল সামান্য মাত্র ছায়া। তখন অকস্মাৎ, ইহা বলা হয়, কোথাও থেকে একটা বিশাল গোখুরা সাপ(Cobra) দৃশ্যমান হল যেটি তাঁকে এবং এখনো ভূমিষ্ঠ হতে দেরি, রাজাকে সূর্য আলো হতে ইহার ফণা মেলে ধরে রক্ষা করল।

অন্য একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যে যখন তিনি প্রাসাদে স্নান করতেন, তখন ধরম একটি মস্ত্ম বড় পানি ভর্তি কলসি কেবল একহাতে উপরে তুলে ধরে তা করতেন, যদিও সচরাচর, ঐ ধরনের কলস ধরতে উভয় হাতে ধরার প্রয়োজন হত, এমনকি যদিও যথেষ্ট শক্তিশালী লোক হওয়া সত্ত্বেও। ধরম ছিলেন একজন দীর্ঘকায় এবং মল্লবীরসুলভ-সুস্বাস্থ্যর

অধিকারী পুরুষ। তাঁর শারীরিক গঠনের জন্য ইহা সাধারণভাবে বলা হত যে ধরম তাঁর মাতৃগর্ভে শুধু স্বাভাবিক নয় মাস এবং কয়েকদিন ছিলেন না, সম্পূর্ণ বার মাস ছিলেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই, তিনি হচ্ছেন ইতিহাসে সু-পরিচিত একমাত্র চাকমা নৃপতি "মহারাজা" হিসেবে।

ইংরেজদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ধরমের পিতামহ, জান বক্স খাঁ আমলে। যদিও বৃটিশরা প্রতিনিয়তভাবে নতুন অঞ্চল অধিকার করে নিচ্ছিল তাদের সাম্রাজ্যর অধীনে, কোন প্রকার ইঙ্গিত ছিল না যে তারা চাকমা ভূখন্ডের প্রতি তাদের আগ্রহ রয়েছে বাৎসরিক কর আদায় করা ব্যতিরেকে। ধরম যিনি তখনও ছিলেন একজন কুমার (অবিবাহিত পুরুষ) একঘেয়েমি দ্বারা ক্লান্ত হচ্ছিলেন। তিনি অন্য কোন কিছু চিন্তা করতে পারতেন না তার দুঃসাহসিক এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী স্বভাবের দরুণ তাঁর প্রিয় অবসর–বিনোদন শিকারে যাওয়া ছাড়া। কোন এক হেমন্তের সকালে তরুণ যুবরাজ তাঁর প্রিয় হাতির পিঠে চড়লেন এবং বনের অভিমুখে অগ্রসর হলেন যেটি কতুকছড়ি হতে বেশি দূরে নয়, কারণ তাঁকে এ এলাকায় প্রচুর শিকার যেমনঃ বড় হরিণ (Sambur), পর্বতে বাস করা ছাগল (mountain goat), বার্কিং ডেয়ার, বন্য শুকর, ভল্লুক, চিতা, এবং মাঝেমধ্যে এমনকি বাঘ, বন্য মহিষ এবং হাতি সম্পর্কে বলা হয়েছিল। ইহা ছিল অপরাহ্নের শেষভাগে যখন শিকারি দল শুকরছড়িতে পৌঁছলেন, কুতুকছড়ি থেকে প্রায় ঘন্টাখানিকের কাছাকাছি, যেখানে তারা রাত্রি যাপনের জন্য যাত্রাবিরতি করলেন। সূর্যাস্তের পর পরই, এক বিশাল ভিড় জমল গ্রাম প্রধানের বাড়ির প্রাঙ্গণে। তারা সেখানে গেল কেবল মাত্র তাদের রাজ মহাশয়কে দেখার জন্য নয়, রাজার সম্মানে চারণ কবিদের গাওয়া বীর যোদ্ধা রাধামন এবং তার প্রেমিকা সুন্দরী ধনপুদি পালা (প্রেম কাহিনী) শুনতে গেল। চারণ শিল্পী এবং তরুণেরা গভীর রাত পর্যন্ত অবিরাম গাথা আর (গানের) ধুয়া গেয়ে চলল। ধরম সচরাচর এই রোমান্টিক মহাকাব্যের অন্য উপাখ্যান উপভোগ করতেন তবে এ বার তিনি দেরিতে রাত জেগে থাকলেন না যেহেতু তিনি পরবর্তী দিন ভোরবেলায় যাত্রা শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তী দিন সকালে দলটি কতুকছড়ি অভিমুখে রওনা হল, এবং ঘন্টাখানেকের চাইতে একটু বেশি সময়ের মধ্যে তারা গ্রামের সীমানায় পৌঁছলেন। তারা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন এবং একটা বিশেষ দূরত্বে হাতিটি রাখলেন কারণ ইহা নির্ঘাৎ দৃষ্টিগোচর সব প্রাণীদের ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দিত এমনকি বাঘ এবং চিতাগুলোকে যদি ইহা তাদের সঙ্গে আরও একটু দূরে যেত। শিকারিরা নানা দিকে সতর্ক পদক্ষেপে গমন করল অপরদিকে ধরম একটা জায়গায় অবস্থান করলেন যেটি অনুকূল অবস্থান হিসেবে মনে করা হত। তবে দিনটিকে রাজার পক্ষে শুভ বলে মনে হল না যেহেতু তাঁর মাজল লোডার (আগ্নেয়াস্ত্র-মুখের ভিতর দিয়া বারুদ ভরিতে হয়) থেকে এমনকি একটি গুলিও ছোড়ার সুযোগ হল না। তারা

দুপুরের খাবার খেলেন কলাপাতা দিয়ে তৈরী করা মোড়ক থেকে যেটি ছিল শুকরছড়িবাসীদের পক্ষ থেকে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে উপহার। মধ্যাহ্নভোজের পর, ধরম সেই দিনের জন্য শিকার খোঁজার আশা ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর অনুচরদের অবকাশযাপন-শিবির স্থাপনের জন্য আদেশ দিলেন। পথে তারা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে থামলেন। একটি গাছের ছায়ার নীচে ধরম এক ফালি ঘাসে-ঢাকা স্থানে হাত-পা ছড়িয়ে বসা নিবারণ করতে পারলেন না এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উপভোগ করতে লাগলেন। সাম্প্রতিক বৃষ্টির পর ভরপুর নিকটবর্তী ঝিরিতে প্রবলভাবে জল প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি ইহা লক্ষ করার আগে, ধরম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ধরমের অনুচরবর্গ পশ্চাদপসারণ করল সশ্রদ্ধ দূরত্বে তাঁকে তাঁর দিবানিদ্রা নিতে যাতে কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে। ধরম অল্পকিছুক্ষণের মধ্যে শিকারগুলো স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন এবং দেখলেন সব প্রাণীদের যেগুলোর সাথে তিনি সম্মুখীন হওয়ার আশা করেছিলেন। তবে তাঁর স্বপ্ন শেষ হওয়ার আগে, তাঁর স্বপ্ন-কল্পনা আকস্মিকভাবে (রূঢ়ভাবে) ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল নীচু থেকে চলে আসা প্রাণবন্ত চেঁচামেচি আর উচ্চহাসির ধ্বনিতে। কিছুটা কৌতুহলের সহিত, ধরম ঝর্ণার দিকে সতর্ক পদক্ষেপে নিকটে এগিয়ে গেলেন, এবং একটি উঁচু খাড়া পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে তাকালেন।

তিনি জল নিতে আসা এক দল তরুণী দেখতে পেলেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন ছাড়া সবাই, মেয়েরা পরস্পরের দিকে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিল যেটি দেখে ধরম মুগ্ধ হলেন। তিনি তাদের দিকে হাঁটলেন এবং যখন তিনি জলপ্রবাহের সন্নিকটে পৌঁছলেন, মেয়েরা একটু পিছিয়ে গেলো বিশাল আকারের সুপুরুষ হওয়ার দরুণ। তারা তাদের হৈচৈপূর্ণ খেলা বন্ধ করল এবং সম্পূর্ণভাবে হতভম্ব হয়ে গেল। কালাবি ছিল একমাত্র যিনি খেলায় অংশগ্রহণ করেনি। সে এমনকি একবারও অপরিচিত লোকটির দিকে তাকাল না। সে দক্ষতার সহিত তার কলসিতে পরিপূর্ণ করে পানি ভরে নিল এবং গ্রামের দিকে যেতে লাগল। ধরম এই গ্রামের বালিকাটির সহজ মাধুর্যময় বিচলন এবং দেহভঙ্গিমা দেখে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি কিছুদূর থেকে কালাবিকে অলক্ষিতে অনুসরণ করলেন।

তরুণীরা নানা ধরণের কথাবার্তা বলতে থাকল। তারা দূর হতে হাতিসমূহ এবং বন্দুক সহ বিরাট অনুচরবর্গ দেখল এবং ভাবল কোন অভিজাতসম্প্রদায়ের লোক কিংবা রাজন্য অবশ্যই শিকারের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তারা জানত না যে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি ছিল তাদের রাজা, যেহেতু ধরম অঘোষিতভাবে এসেছিলেন। তারা সবাই পরস্পর ঠাট্টা মশকরা করতে লাগল তাদের মধ্যে থেকে কে ঐ অচেনা উন্নতকায় লোকটিকে মনে মনে কামনা করতে পারে। তারা অত্যন্ত লাজুক ছিল ধরমকে পশ্চাদ্ধাবন করতে এবং জানত না যে তিনি কালাবিকে অনুসরণ করতেছিলেন।

ইতোমধ্যে ধরম কালাবির বাড়িতে পৌঁছলেন, কালাবি ইহার আগেই ভিতরে গেলেন। ধরম মুখে দুষ্টামিপূর্ণ হাসির সহিত বাড়ির ইজরের (বারান্দা) পাশে কাঠের গুড়ি দিয়ে তৈরী করা সিঁড়ির পাদদেশে দাঁড়িয়ে রইলেন, সশব্দে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন বাড়িতে কেহ আছে কিনা। কালাবি একা ছিল বাড়িতে। তার পিতামাতা এবং জয় মুনি তাদের অল্প কিছু জায়গাতে চাষ করা আমেই ধান সংগ্রহ করতে তাদের জুমের ক্ষেতে গিয়েছিল যেটি তারা সচরাচর বিশেষ কোন উপলক্ষের জন্যে জমা রাখত। যখন কালাবি ইজরে (বারান্দা) বের হয়ে আসল, ধরম কিছু পানি চাইলেন। এবং আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা না করে, তিনি ইজরে (বারান্দা) উঠে গেলেন। কালাবি ধরমকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করল যেন সে বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় হত এবং তৎক্ষণাৎ পানি রাখার মাটির তৈরী বড়ো জগটি এনে দিল। সে তার পরিবার, তাদের জুম ক্ষেত ইত্যাদি সম্পর্কে সবিনয়ে তবে সলাজে তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর দিল। পুরো কলসির পানি খালি করার পর, ধরম কালাবিকে ধন্যবাদ জানালেন এবং অবকাশযাপন-শিবিরের দিকে রওনা হলেন, জেনে যে তাঁর কর্মচারীবৃন্দ কিছুটা দুঃচিন্তাগ্রস্ত হবে এবং তাকে খোঁজ করতে থাকবে। কালাবি ধরম সম্পর্কে তার পরিজনবর্গকে বলল যখনই তারা বাড়িতে পৌঁছল। যখন সে ইংরেজদের পাজামা বিশেষ পরা এক দীর্ঘকায় লোকের সম্পর্কে শুনল যিনি একবারে পান করেছিল যতটুকু পানি পুরো পরিবারটির লেগে যেত খাবারের সময়, গুজাং নিশ্চিত হল যে ঐ লোকটি স্বয়ং চাকমা রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। পুরনো ঐতিহ্য অনুসারে, চাকমা রাজারা কখনো সাধারণ লোকের ঘরে বেড়াতে যেতেন না, যদিও তারা ভ্রমণরত অবস্থায় এবং আদালতে তাদের প্রজাদের সাথে সাক্ষাৎ হতেন। ইহা সম্ভবত এই বিশ্বাস করার কারণে যে যার বাড়িতে রাজা বেড়াতে যান অশুভ কিছু সাধারণ লোকটির উপর নেমে আসতে পারে, যদি না পরিবারটির প্রধান একটি উপাধি দ্বারা ভূষিত না হয়ে থাকে। অন্যান্য এবং অপেক্ষাকৃত কম শ্রেয় বিকল্প যেমন-তান্ত্রিক কিংবা ওঝার মাধ্যমে এক ধরনের পরিশোধনের প্রথা অবলম্বন করতে হত। এমনকি বর্তমানেও, চাকমা সমাজে গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকজনের মধ্যে এ প্রথা প্রচলন রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে গুজাং চিন্তিত হয়ে পড়ল। তিনি গ্রামের প্রধান কিংবা অন্য কোন ধরনের অভিজাত সম্প্রদায়ের শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হতে স্বপ্ন দেখেনি, অন্যদিকে তিনি কেবল কোন রকমে প্রথাটি পালন করার মত খরচ যোগাতে সক্ষম। সৌভাগ্যেক্রমে, অবিলম্বে গুজাং এর এ উভয়-সংকটাবস্থা কেটে গেল। সপ্তাহের মধ্যে, সে রাজার হুকুমনামা পেল রাজানগরে নিজে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার জন্য। রাজা অনুষ্ঠানিকভাবে গুজাংকে "দেওয়ান" উপাধি এবং তরবারি প্রদান করলেন।

তখনকার সময়ে, দেওয়ান উপাধি ধারণ করা মানে বিশেষ সুবিধাসমূহ যেমন-খাজনা থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং মৌসুমের প্রথম ফসল এবং শিকারের রান (পাছা এবং উরুর মাংস) রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ লাভ করা, তবে ইহা অপরিহার্যভাবে উল্লেখযোগ্য রকমের সরাসরি আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি বুঝায় না, যদি না ইহার সাথে নিম্নভূমিতে কৃষিজমি প্রদান করা না

হয়। গুজাং তখনো তার জুমচাষ করত। লাজুক এবং বিনয়ী লোকটি তখনও নিশ্চিত ছিল না যে তার চাকমা অভিজাত সম্প্রদায়ে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার বিষয়টি আদৌ একটি ভাল কাজ হবে কিনা। তিনি নিঃসন্দেহে লজ্জা বোধ করত, তার নিজ গ্রামবাসীরা তাকে আর আগের মত করে অন্তরঙ্গভাবে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করত না বলে। ঠিক আছে আচ্ছা, বলে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিত, অন্তত সে বিশাল আকারের বুদ্ধমূর্তি সহ, যেখানে সে ফুল দান করেছিল, রাজপ্রাসাদ এবং বৌদ্ধ মন্দির দেখেছিল।

কালাবির অবস্থা একই রকম থাকল। তার বান্ধবীরা তাকে অনবরতভাবে খেদাতে থাকল রাজার সাথে তার সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তারা জিজ্ঞাসা করতে থাকল রাজা তাকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কিনা আরও নানা কিছু। কেউ কেউ এমনকি তাকে "রাণী" ডাকতেও শুরু করল। কালাবি শুধুমাত্র হাসত। ভিতরে ভিতরে সে মাঝেমধ্যে লজ্জায় প্রায় কান্নার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হত। যদিও সে প্রকৃতপক্ষে ধরমকে খুব পছন্দ করেছিল, সে নিজেকে বলত যে রাজাকে নিয়ে কোনরূপ ব্যক্তিগত অনুভূতি লালন করতে শুরু করা ইহা সাধারণত তাকে মানায় না। সে, অবশ্যই, চিন্তা করেনি যে রাজা বিশেষ কোনভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, যেহেতু তিনি কোন ঐরূপ অনুভূতি (অজ্ঞাতভাবে) প্রকাশ করলেন না তাঁর তার (কালাবির) সাথে কথাবার্তার প্রাক্কালে। তবুও যখনই সে তাঁর সম্পর্কে ভাবত, যেটি প্রায় সময় ঘটত, সে ধরমের অভাব বোধ করত যেন ধরম তার সারাজীবন ধরে চেনা কেহ। যদি কেউ তাকে (এভাবে) লক্ষ করত তারপর, তারা অবশ্যই তার আরক্তিম ভাব এবং তার প্রচন্ড অস্বস্তিকর মানসিক চাপ ঢোক গিলে গোপন করার প্রয়াস খেয়াল করত। রাজার শিকারের জন্য ভ্রমণের কাল থেকে যখন এক মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল রটন্তীরা ক্লান্ত হতে লাগল এবং গুজাং দেওয়ানের গ্রাম ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসল।

ইতোমধ্যে, চাকমাদের রাজধানীতে, যারা রাজা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেন লক্ষ করলেন যে তিনি পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। ধরম প্রেমে পড়লেন। তিনি জানতেন যে তাঁর পরিজনবর্গ তাঁকে প্রভাবশালী দেওয়ানদের মধ্যে থেকে যারা তাঁর রাজদরবারে ভিড় করত যে কারোর যোগ্য কন্যার সাথে বিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ধরম কালাবিকে তাঁর মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যখন এক ঋষি [মহাজ্ঞানী] তাকে বললেন যে তিনি যেন কালাবিকে তাঁর রাণী হিসেবে বরণ করে নেন। ধরম তাঁর মন স্থির করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে রাজদরবারের পরিকল্পনাকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করবেন এবং তাঁর সঙ্কল্পটি ঘোষণা করলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, রাজার কথা মানে ছিল আইন।

চাকমাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিয়ের উৎসবের সমস্ত প্রকার আনুষ্ঠানিকতা চলতে লাগল। রাজার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় গেলেন গুজাং এর সাথে দেখা করতে

আনুষ্ঠানিকভাবে তার কন্যার বিয়ের সম্মতি জানতে চাইতে এবং বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করে ফেলতে। ঐতিহ্যগতভাবে বরের প্রতিনিধিদের তিনবার কনের বাড়িতে যেতে হল। তারা প্রতিবারে পাহাড়সম উপঢৌকন নিয়ে হাজির হলেন। প্রথমে তারা চাউলের পিঠা, ফল এবং চাউল দিয়ে চোলাই করা মদ সাথে নিয়ে গেল। পরবর্তীতে তারা অন্যান্য উপহার সামগ্রী যেমন বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে আমদানিকৃত সূক্ষ্ম কাপড়, জাঁকজমকপূর্ণ পুঁতির এবং কাচের সাহায্যে নানাবিধ নকশাযুক্ত অলংকার এবং ছোট আকারের সূক্ষ্ম কাচের আয়না নিয়ে গেল। গ্রামে তরুণীদের মাঝে প্রচুর প্রাণবন্ত আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল বিশেষভাবে খেতাবকে কেন্দ্র করে, কারণ কালাবির সব কুমারী বান্ধবীরা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল কনের বিশেষ সহচরী হওয়ার জন্যে যে কালাবির সঙ্গে রাজবাড়িতে যাবে। যে যাহা জানত না কেন, সম্ভবত তখনো সেখানে চারপাশে আরও কয়েকজন রাজকুমার থাকতে পারত?

নির্ধারিত দিনে, রাজার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ জেঠা মহাশয় গুজাং এর গ্রামে বরের দলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মহিলা এবং বৃদ্ধরা হাতির পিঠে চড়ল, অপরদিকে অন্যান্যরা পিছে পিছে হেঁটে গেল। গুজাং এর গোত্র একটি ভোজ সভার আয়োজন করল যেটি ছিল এমন ধরনের যে যা গ্রামবাসীরা আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। পরবর্তী দিন সকালে এক শুভক্ষণে, বরের এবং কনের দল একত্রিত হল রাজানগরে অভিমুখে তাদের যাত্রা করার উদ্দেশ্যে। অতি বৃদ্ধ এবং অসুস্থ মানুষজন ছাড়া প্রায় সব গ্রামবাসীরা কনের পক্ষে সহযাত্রী হল। ধরম অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন যেহেতু সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী বর বিয়ের কনেকে নিয়ে আসার নিষেধ রয়েছে। চাকমাদের প্রথানুসারে, তিনি তাঁর নববধূর সাথে একা থাকতে পারবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তাঁর শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে না যান, বিবাহ উৎসবের পর।

রাজানগরে বিবাহের আনন্দঘন উৎসবসমূহ ছিল মেলা এবং ভোজ পর্ব যা শুরু হল দুপুরের দিকে এবং শেষ হল গভীর রাত্রিতে। একজন বৈদ্য বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল এবং চুমুলং পূজার কাজ সম্পাদন করা হল। ঐতিহ্য অনুসারে একটি শুকরের মাথাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হল। বৈদ্যর মাধ্যমে যুগল দম্পতি পরস্পরকে ভাত এবং ডিম খাওয়ালেন এবং ঘোষণা করলেন ধরম এবং কালাবি, এখন বর্তমানে আনুষ্ঠানিকভাবে কালিন্দি, স্বামী স্ত্রী, প্রথানুসারে, উপস্থিত সবায়ের সম্মতি এবং আর্শীবাদ নিয়ে। বিয়ের উৎসবে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কুতুকছড়ি গ্রামের স্বয়ং বৈদ্য যিনি যুক্তি খাড়া করতেন এবং সবাইকে বলতেন, কানে যতদূর শুনা যায় কিভাবে তিনি রাণীর সৌভাগ্যে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

কয়েকদিন পর, নতুন বিবাহিত দম্পতি বিশাল অনুচরবর্গ সহকারে এবং খাদ্যদ্রব্য এবং পোশাক পরিচ্ছদ হাতির পিঠে করে কুতুকছড়িতে বেড়াতে গেলেন। গ্রামটিতে ধরম সেই

জায়গায়টিতে যেতে চাইলেন যেখানে তিনি তাঁর ভাবীকালের রাণীকে প্রথম দেখেছিলেন। এবং সেখানে প্রথমবারের মত ঠান্ডা পানিতে, দম্পতি একত্রে স্নান করলেন।

ধরম এবং কালিন্দির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল শুধুমাত্র ধরমের মৃত্যুের পরবর্তী সময়ে। তিনি মৃত্যু বরণ করার পর, কালিন্দিকে ফিরিঙ্গিদের সাথে মুখোমুখি হতে হয়েছিল, যারা করদ রাজ্যে হিসেবে রাখার বদলে চাকমা রাজ্যেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপরিহার্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে নিতে আগ্রহী ছিল। তিনি অঞ্চলটিকে ক্রমে ক্রমে দখল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। বৃটিশরা পাহাড়ি আদিবাসীদের জন্যে পার্বত্য অঞ্চলে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট (তত্ত্বাবধায়ক), তরুণ ইংরেজ সেনা-কর্মকর্তা পাঠাল কিন্তু তিনি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে তার ইচ্ছামাফিক পার্বত্য রাজ্যেটির প্রশাসন পরিচালনা করতে দিতেন না। এ কাজে তিনি দেওয়ান এবং অন্যান্য গোষ্ঠী প্রধানদের এবং সব তাঁর প্রজাদের সমর্থন পেতেন। তাঁর মৃত্যুের আগ পর্যন্ত, তিনি, চাকমাদের এবং অন্যান্যদের যারা তাঁর ভূখন্ডে বসবাস করত, অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন।

যদিও তিনি কখনো অনুপ্রবেশকারীদের এবং ঔপনিবেশিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, কালিন্দি যিনি ইতিহাসে একমাত্র চাকমা রাজ্যশাসিকা রাজ্ঞী, একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং সহৃদয়ের অধিকারী নেতা ছিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত, যখন তাঁর বংশধরেরা রাজানগরে পুরাতন রাজবাড়িতে, চট্টগ্রাম জেলাধীন (পুকুর এবং আশেপাশের ধান্য জমিসহ যেটি এখনো চাকমা রাজার মালিকানাধীন) বেড়াতে যায় স্থানীয় বাঙালিরা এখনো তাঁর সম্মানে এবং (বর্তমান) পদাধিকারী রাজা এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের, ধরম বক্স খাঁসহ সম্মানে শ্লোগান দিয়ে থাকে। রাজানগরে মন্দিরের পাশে দম্পতিদের সমাধিস্থানটি রয়েছে। ধরম বক্স খাঁর একটি কাব্যাকারে, মার্বেলের শ্বেত পাথরে তৈরী, ইপিটাফে (সমাধিলিপি) যেটি তাঁর প্রপৌত্র রাজা ভুবনমোহন রায়ের কর্তৃক রচিত, এখনো চাকমা রাজবাড়িতে সংরক্ষিত রয়েছে, যেমন রয়েছে কালিন্দির ব্যবহার করা হাতি দাঁতে তৈরীকৃত খড়ম এবং চেয়ার। সুগত চাকমা (ননাধন), বর্তমান সময়ের একজন সুপরিচিত লেখক কালিন্দি রাণীর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখেছেন, উল্লেখ করে যে তিনি চাকমাদের জ্ঞানপঞ্জিকার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন চিরদিন। কবিতাটিতে সুর সংযোজন করা হয়েছিল যেটি স্কুলের ছেলেমেয়েরা মাঝেমধ্যে গেয়ে থাকেঃ

চাকমা রাজপথে জনপদে ত নাং
বাজি থোক বাজি থোক, জনমান
রাণী, তুই বাজি থাক, রাণী তুই বাজি
থাক।

.....

* পাপেল চাকমা, সমাজকর্মী, chakmapapel18@yahoo.com

মুজিবুল হক বুলবুল

কাট্টল পাগোক, বিঝু এযোক-------
আদিবাসি জীবনে বিঝুর আবাহন

ঘন অরন্যরাশি, পাহাড়ের চুড়ায় নীল ধূসর মেঘের স্পর্শ আর চিরসবুজ ঝোপের বুকে সবুজ পাখিদের ডানার শব্দ, দূর প্রান্তর থেকে ভেসে আসা গবাদি পশুর গলায় বাঁধা ঘণ্টার শ্রুতিমধুর শব্দ, পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে লাল রংগা পিননে তরুণীদের পানি তোলার দৃশ্য, জুমের ঢালুতে নিবিষ্ট মনে কৃষকের ফসলবোনার আয়োজন সহ খন্ড খন্ড ভাল লাগার দৃশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জীবনধারার পূর্ণতাকে উপস্থাপন করে।

আপন মনে বয়ে যাওয়া শঙ্খ, কর্ণফুলী, মাইনী, কাচালং নদীর স্রোতধারা হয়তো নিজের প্রানের আনন্দ নিয়েই এগিয়ে যায় নীরবে নিভৃতে। কিন্তু সেই আনন্দে নেই কোন কৃত্রিমতা, নেই কোন অতিরিক্ত রঙের উদ্দামতা। তবে সেই রং এ রয়েছে প্রকৃতির প্রকৃত রং। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একই রং দ্যুতি ছড়িয়ে দেয় আরও বেশি উজ্জলতায় বিঝুর উৎসব মুখর দিনে পাহাড়ি জীবনে। ফাগুনের উর্বর সময় থেকে যেভাবে প্রকৃতি প্রস্তুত হয় বিঝুর জন্য তেমনি আদবাসী জীবনেও তার ছোঁয়া লাগে গভীর উচ্ছ্বাসে। ফুল-ফল পাখিদের গান থেকেই বোঝা যায় কোন একটি উৎসব এগিয়ে আসছে------ ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টানোর প্রয়োজন নেই। ফাগুন থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রকৃতির প্রস্তুতি। বাতাসের স্পর্শেও বোঝা যায় ভাললাগার অভূতপূর্ব অনুভূতি। আম, কাঁঠাল সহ বহু প্রজাতির ফুল ও ফলের স্ফূরণ ঘটে এ মাসে। শীতের মৃতপ্রায় তৃণ লতা ফাগুনের স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায়। গভীর অরন্যেও অসংখ্য বুনফুল, পাহাড়ী কলা, তারা নামক সব্জি, ঢেঁকি শাকের আবির্ভাব ঘটে। ভেসে আসে অসংখ্য নাম না জানা সৌরভ। যখন ক্যালেন্ডার ছিল না, ঋতু, মাস, বছর গণনার জন্য সাধারন মানুষের কোন ধারণা ছিল না তখন বিশেষ বিশেষ মাসের বৈশিষ্ট্য, বৃক্ষের ফুল, ফল, পাখিদের গান থেকেও হয়ত মানুষ সময়-ঋতু সম্পর্কে ধারণা লাভ করত। তাই প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভ আধুনিক যুগেও থেমে নেই। তাই যুগে যুগে প্রকৃতির উপর বৈরীতা মানব সমাজের ধ্বংসই ডেকে এনেছিল এটাই ইতিহাসের তথ্য। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও প্রকৃতির সহ অবস্থান অবিচ্ছিন্ন বলেই তাদের একে অপরের পরিপূরক। তাই এখানকার জীবন, মৃত্যু আনন্দ বেদনা প্রকৃতিকে ঘিরেই আবর্তিত। যদিও বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় জীবনধারায় ছন্দপতন ঘটেছে তবুও বিশ্বাস করা যায় কখনোই সব কিছুর মূল সুর হারিয়ে যাবে না।

ফাগুনের লাল-হলুদ-বেগুনি-সাদা ফুলের আচ্ছাদনে বসে কোকিল আর বিঝু পাখীর হৃদয় আকূল করা “কাট্টোল পাগোক, বিঝু এযোক” ডাক ভেসে আসে। তখন কারো বুঝতে

বাকি থাকে না। বিঝু আসন্ন তাই প্রকৃতি নিটোল ভাবে তার অপরূপ আভরণে নিজেকে বিলিয়ে দেয় উৎসব আয়োজনে। আর তাই মানুষ প্রকৃতির এই উপহারকে বরণ করে নেয় অসামান্য পবিত্রতায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আদিবাসীদের মধ্যেই বিঝু উদ্‌যাপনের প্রচলন রয়েছে। নামকরণে পার্থক্য থাকলেও আবেদনে কোন তারতম্য নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিঝু, বৈসুক, সাংগ্রাই, উৎসবের আদ্যাক্ষর দিয়ে সাজানো শব্দ “বৈসাবী” নামেও এ উৎসবকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এটি মূলত সম্মিলনেরই বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নেয়া হয়। এই উৎসব তিনদিন ধরে উদযাপিত হয়ে থাকে। প্রথম দিনকে ফুল বিঝু, দ্বিতীয় দিনের উৎসবকে মূল বিঝু এবং তৃতীয় দিনের উৎসবকে গোজ্যাপোজ্যা বা নুয়া বঝর বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাংলা চৈত্রমাসের সর্বশেষ দিন হচ্ছে মূল বিঝু, মূল বিঝুর পূর্বের দিনটিকে ফুল বিঝু এবং পহেলা বৈশাখকে গোজ্যাপোজ্যা বলা হয়। ত্রিপুরা আদিবাসীদের মধ্যেও তিনদিনের অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা তিনদিনের অনুষ্ঠানকে যথাক্রমে হারি বৈসুক, বিসুমা, বিসিকাতাল নামে সম্বোধন করে থাকেন। মারমা আদিবাসীরা এই উৎসবকে “সাংগ্রাই” নামে অবিহিত করে।

প্রত্যেক ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের মর্মকথা হচ্ছে পবিত্রতা, পাপ মোচন ও ভবিষ্যতে সুখ আর শান্তিতে থাকার প্রার্থনা। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে বর্তমানের অত্যাধুনিক সমাজ ব্যবস্থায়ও এর ব্যাত্যয় ঘটেনি। বিঝু উৎসবের সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করলেও উপরোক্ত সত্যটি বেরিয়ে আসে। তাই আমরা দেখতে পাই ফুল বিঝুর দিনে আদিবাসী তরুণীরা নদী ও ছড়ার প্রবাহমান জলধারায় কলা পাতায় ফুল সাজিয়ে ভাসিয়ে দেয় আর ভাসিয়ে দেয়া কদলী পাতার ভেলার সঙ্গে নিজের একান্ত প্রার্থনাটিকেও পাঠিয়ে দেয় দেবতার তুষ্টির জন্য। যেন তার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হয় জীবন সুখে পরিপূর্ণ হয়। বলা বাহুল্য বিঝুর দিনে সাধারণত কেউ জেনে-শুনে কোন খারাপ কাজ করে না।

তিনদিনের অনুষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। ফুল বিঝু প্রকৃতপক্ষে মূল বিঝুর প্রস্তুতিকেই তুলে ধরে। এদিনে ঘর-বাড়ি পরিপাটি করে রাখা, যেহেতু মূল বিঝুর দিনে প্রাণী হত্যা করা হয়না সেহেতু, ফুল বিঝুর দিনে পাহাড়ি ঝর্ণা, নদী থেকে মাছ সংগ্রহ, গভীর অরণ্য থেকে পশুপাখি শিকার, শাক-সব্জি সংগ্রহ, প্রবীণদেরকে স্নান করানো। চাকমা গ্রামে গেংগুলি চারণ কবিদের গানের আসর, ত্রিপুরাদের গরায়া নৃত্যের আয়োজন, নদীতে ফুল ভাসানো ইত্যাদি প্রারম্ভিক কাজের মধ্য দিয়ে মূল বিঝুকে আবাহন করা হয়।

মূল বিঝু আনন্দময় একটি দিন। সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক বাড়িতেই খাবার-পানিয়ের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অন্যতম খাবার হচ্ছে “পাজন” বা নিরামিষ তরকারী। বহু সব্জির সহযোগে এই পাজন তৈরি করা হয়। এতে অবশ্য শুটকিও মেশানো হয়। বহু

সব্জির সহযোগে এই তরকারীতে ঔষধীগুণ থাকে বলে ধারণা করা হয় এবং সারা বছর শারীরিক সুস্থতার জন্য এই খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক বলে মনে করা হয়। এছাড়া কাউন চালের পায়েস, বিন্নি চালের তৈরি বিভিন্ন ধরণের পিঠার আয়োজন করা হয়।

অবশ্য ইদনিং সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপ্যায়নের সামগ্রী হিসাবে মুরগীর রোস্ট, পোলাউ, ঠান্ডা পানীয়ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তবে ঐতিহ্যবাহী খাবার অবশ্যই খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য পাচ্ছে। তাছাড়া স্থানীয় ভাবে তৈরি জগরা, কাঞ্জি, দচোনি পান করা হয়ে থাকে উৎসবের দিনে।

মারমা আদিবাসীদের মধ্যে সাংগ্রাই অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত হয়। তাদের পানি খেলা অত্যান্ত আনন্দের অনুষঙ্গ। দুদিনের চরম আনন্দ উৎসবের পর ভাললাগা ক্লান্তি নিয়ে আসে। অনুষ্ঠানের শেষ দিন গোজ্যাপোজ্যা। প্রকৃতি আর মানুষের অটুট বন্ধনের বহিঃপ্রকাশ বিঝু। তিনটি দিনকে নিয়ে মানুষের স্বপ্ন, ভালবাসা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবন চক্র আবর্তিত হয় একটি নির্দিষ্ট ছকে। আদিবাসীদের বিশ্বাস, মূল্যবোধও এখানে জড়িত। তবে প্রকৃতি যেভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাতে এই জীবনধারার বৈশিষ্ট্য কতদিন অক্ষুন্ন থাকবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। তবুও আমাদের স্বপ্ন কখনোই ম্লান হবে না বলেই বিশ্বাস করি।

.....

* মুজিবুল হক বুলবুল, বিশিষ্ট কবি, গীতিকার, নাট্যকার, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, রাঙামাটি জেলা শাখা।

অনিল বরণ চাকমা

জাগো বিশ্ব চাকমা ইন্ডিজিনাস

জাগো, জাগো, জাগো, জাগো আজ,
জাগো বিশ্ব চাকমা ইন্ডিজিনাস
তুলো তুলো সবে উচ্চ শির।
কাঁপাই আকাশ
কাঁপাইয়া বাতাস
কাঁপাইয়া মেদিনী জলধি নীর।
জাগোরে জাগোরে সবে
জাগো আজি এ আহবে
ভুলি ভেদাভেদ
সকল বিভেদ
আমরা স্বদেশভক্ত বীর।
শান্তি কামী, শান্তি চুক্তি
কলা পাতার অভিব্যক্তি
রাজনৈতিক মিথাচার
আর্ন্তজাতিক দুনিয়ার
বিনাকাজে পুরষ্কার হাসিনাজির।
ওরে স্বদেশ হারা
স্বজন হারা,
ঘুরচ্ ফিরে নিখিল ধরা,
জাগাও তরঙ্গ তুলি
জাগাও কর্ণফুলী
রক্ত তপ্ত- নীর।
জাগো, জাগো, জাগো, জাগো আজ,
জাগো বিশ্ব চাকমা ইন্ডিজিনাস
তুলো তুলো সবে উচ্চ শির।

.....

* অনিল বরণ চাকমা, বিশিষ্ট কবি, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত।

চাকমা অসীম রায়

মুখোশ নয়

হাজার হাজার
বছর ঘটে যায়
যুগান্তর পথ হাঁটা পাড়ি দিয়ে
নির্মোক রূপান্তরে
রাত, দিন, আসে।
মনে টিপ–
স্মরণের প্রেম নিরুপমার
সহচর পাশাপাশি
অসীম হ্রদের অনুভব কিনারায়।
পাহাড়-পাহাড় ছড়া-গাঙের
দেহজ ইশারায়,
ভালোবাসা অলিগলি হাঁটে
অন্তরের, দেখা অদেখায় জনমে মরনে।
জীবনের কথা কতেক
জমা থাক– পৃথিবীর বুকে;
জীবনের কথা কতেক
জমা থাক– আগামীর পথে;
কঠিন তুমি, কোনো দিন
বুকের বিশ্বাসে আমার কাছে–
কোনো কথা নির্ভয়ে বলা হলো না।
তোমার সে–বুকে মাথাটি রেখে
কতই নিঝুম দুপুর, কতই বিভোর দুপুর,
নিশি-রাত কাটালুম,
পতঙ্গ-কীট, আর পাখি
সুর মূর্চ্ছনায় লালিত যুগে–
পতঙ্গ-কীট, আর পাখী
সখ্য-ললিত স্বরে পৃথিবীর বুকে।
প্রেম বেসাতির দুরন্তপনায়
এখনো আজি মায়ার বাঁধনে হই
বিশ্বাস বিহীন পথেই থাকা পথিক-নাগর।

তত্ত্ব মিলে না– শূন্য এ বুকে কী আমি
এ' যুগে কিছুক্ষণের মানুষ শুধু–(!)
এ' যুগে ক্ষণান্তরে দুঃখী কোনজন–(!)
কত দিন হাঁটার শেষে
অগুনতি মানুষ হঠাৎ দেখা
না-না– না-না না-না– নানা-নানা
ফিরিও না মুখ লুকিও না মুখ
না-না– না-না না-না– নানা-নানা
কেমন আছ॥
চিল ওড়ে মগ্ন
দুপুর, নারী-পুরুষ
হেঁটে যায় খুশি পরাণ
চোখেতে হাসি আছে লেখা ॥
দিগন্তের অনুরাগে ব্যাপী সবকিছু হোক
দুনিয়ার ইন্সাফ-আদি সোপান রচুক
দিগন্তের অনুরাগে।
আমাকেই আমি বললাম
কবে আবার হবে দেখা–
কেমন আছ (?)

.....

* চাকমা অসীম রায়, বিশিষ্ট কবি, শান্তিপুর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত।

শ্যামল তালুকদার

তখন প্রথম যৌবন

তখন প্রথম যৌবন
প্রজাপতির সাথে মেলিত ডানা
দুরু দুরু মন,
কখনো কহিত কথা
আধো ফোটা কুসুমের সাথে,
রবি হয়ে উঠিত কভূ
কভূ-বা চাঁদ হয়ে নিঝুম সন্ধ্যারাতে।
তখন প্রথম যৌবন–
দিনগুলি বয়ে যেত কলকল
ঝরণার মতন,
কত কথা উথলি উঠিত
ছিল মন উড়ু উড়ু,
মেঘেদের সাথে ডানা মেলিবার
ঘুম হতে জাগিবার
এই বুঝি হল শুরু,
তাই বুঝি কচি মন ছিল দুরু দুরু।
তখন প্রথম যৌবন
দু'আখিতে ভরা ছিল
কত না স্বপন,
নির্ঝর হয়ে, গহীনে বাজিত
বুঝি-বা বাঁধ ভাঙা গান,
অনুভবে বুঝেছিনু হয়ত-বা
দূর মহাসাগরের টান।

তখন প্রথম যৌবন–
বুকভরা সুখ আর
ছিল সাধে ভরা মন,
স্বপ্নের সাথে মিতালী পাওয়া
খেলিত কত না খেলা,
সেই খেলা খেলিতে খেলিতে, হায়
মেঘে মেঘে গেল মোর বেলা।
তখন প্রথম যৌবন–
স্বপ্ন আর বাস্তবে কত না তফাৎ
বুঝিনু এখন,
তবু আজো মালা গাঁথি
স্বপ্ন দেখিবার ছলে,
মালাগুলি পিষে নিঠুর বাস্তব
তার দু' পায়েতে দলে।

* শ্যামল তালুকদার, বিশিষ্ট কবি, উত্তর কালিন্দীপুর, রাঙামাটি।

নজরুল ইসলাম সাচী

ভরা পূর্ণিমায়

ভরা পূর্ণিমা রূপে জেগেছিলো
বিক্ষুব্ধ এ পৃথিবী
নীল সাগরের জল ছুয়ে
থোকা থোকা সাদা মেয়েরা
নিয়ন আলোর স্নিগ্ধতায়
প্রিয়তমার, দক্ষিনার জানালায়
উঁকি দিয়েছিলো
মাঘমনিন্দ সাদা বিছানায়, যুগলবন্দী
প্রেমের ছন্দে নাচায়েছিলো
কাল ভরা পূর্ণিমার রাতে।
কালের যাত্রায়ু প্রিয়তমার দুচোখে
নতুনের ভাবনা দোলায়েছিলো।
ভরা পূর্ণিমার রাত।
আধো আলো, আধো ছায়া
ধোন সপুড়ের দিঘির জলে
নিরব জীবনের আগন্তুক
এক অচেনা পথিকের আজন্ম
তৃষ্ণা, মেটায়েছিলো
ভরা পূর্ণিমার চাঁদ।
তৃষ্ণার্থ প্রেমের স্রোতে
চলে যাওয়া প্রেমিকার
কৌতুহলী প্রাণে ঝিঝির ডাকে কর
শব্দাবলী, দূরে দেহের দোকানী নিয়ে।

* নজরুল ইসলাম সাচী, কবি, সেক্রেটারী, সাউথ এশিয়ান এন্ড কালচারাল ফোরাম, ঢাকা।

সিরাজুল করিম

কেবল কবিতাই পারে

নদীতো জানি চিরদিন ছুটে চলে সাগার পানে অবিরাম
দু'পাড়ের শষ্যের মাঠে রেখে যায় তার ভালোবাসার
বংশবৃদ্ধির আদিম শষ্যের উৎপাদনের দরকারী উর্বরতা
তুমিও তেমনি সাগরের কাছে আসবে-আসতেই হবে।

সাগরতো তোমারই তাবৎ কষ্টের নীল রঙ বিষ
শুষে নিয়ে তোমাকে শূন্যতার যন্ত্রণামুক্ত করার
ব্যাকুল বাসনায় সময় কাটায় ভালোবাসার বিশ্বাসে
তুমি কেনো যন্ত্রণামুক্ত হবেনা সুখের অর্ঘ্য নিবেনা?

নদী, তুমি তোমার সৌন্দর্যের মুখ ফিরিয়ে নিলেতো
সাগরের কিছুই হবেনা তোমারই জমিন শুকিয়ে যাবে
সাগরতো ভালোবাসার তরল প্রবাহে তোমাকেই বাঁচাবে
তুমি কোনোইবা তার সাহচর্যে বেঁচে থাকতে চাইবে না?

সাগরের বিশাল বিস্তৃত হৃদয়ের নিবিড় একান্ত আসনে
সবাইতো বসতে চায় অমরত্বের বাসনা সবারই থাকে
তুমিই শুধু অদৃশ্য নষ্ট প্ররোচনায় সরিয়ে নিচ্ছ নিজেকে
কেবল কবিতাই পারে কালান্তরে বাঁচিয়ে রাখে তোমাকে।

.....

* সিরাজুল করিম, কবি, সভাপতি, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।

কে.ভি. দেবাশীষ চাকমা

তোমাকে মনে পড়ে

সাত সকালে ঘুম ভেঙ্গে সারা দিন কাজের ব্যস্ততায়
সূর্যাস্তে সন্ধ্যে এসে দু'মুঠো অন্ন খেয়ে আনমনে বিছানায় শুয়ে পড়ি।
বিছানায় ঘুম আসে না মনে পড়ে কত কথা
সারাটা দিন কি কর্ম করে নিলাম হিসাব করে দেখি।
ভাবতে ভাবতে অন্তরে ভেসে উঠে কত মানুষ এলো গেলো ,
আমি এখনো তোমার অপেক্ষায় রয়েছি, তুমি কি তা জানো ?
কোন একদিন বলেছিলে, আজ আসি কাল নেই,
কত মানুষ আসবে-যাবে এ ভাবার কোন প্রয়োজন নেই।
কোন দিন যদি তোমার পাশে না থাকি, আমার প্রতিক্ষায় থাকো না,
নিরন্তর কাজে এগিয়ে, প্রতিষ্ঠিত করে নিও নিজেকে।
আজ তোমাকে নানা জনে নানা কথা কইছে আরো করছে উপহাস
প্রতিক্ষায় থাকবে মানুষের মত মানুষ হওয়া এটাই বুঝতে হবে।
তোমার হৃদয় নিংড়ানো কথায় আমি মত্ত, এখন তুমি নেই
মানুষের মত মানুষ হলাম, তোমার কথা অন্তরে রেখে
এটা ভাবি ওটা ভাবি আরো ভাবি তোমাকে
ভাবতে ভাবতে দিন গেল মাস গেল
বছর পার হয়ে গেল, তবুও তুমি এলে না।

১৫-০৯-২০১০ খ্রিঃ

.....

* কে. ভি. দেবাশীষ চাকমা, কথাসাহিত্যিক, সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী কবি পরিষদ।

সুনির্মল কুন্ডু

রবি তুমি লহ প্রণাম

সার্ধশত বর্ষে রবি তুমি লহ প্রণাম।
তোমার কিরণে
কবি, সাহিত্যিক লেখক, গীতিকার,
গল্পকার, নৃত্য নাট্যকার,
গল্পকার, নৃত্য নাট্যকার,
পুষ্ট হয়েছে আজ।
রবি তোমার করি প্রণাম,
করি প্রণাম, করি প্রণাম,
ওপার হতে তুমি করোগো আশিবার্দ।

লক্ষ্মী কান্ত কর

এক চিলতে উঠোনের গল্প

আগুনের সংসার পেতে
গ্রীষ্মকে ভয় পাই -
প্রতিটা জীবনেই আগুনের যন্ত্রণা
শুধুই জ্বলতে জ্বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা

এই প্রবল গতিপথে কেউ কোথাও
স্থির নয় একদন্ড।
কচুপাতার মতোই
হাওয়ায় দুলতে দুলতে
সৃষ্টির হলুদ মাখা মাত্র।

আলোয় আলোয় অজস্র মায়া
মায়ায় মায়ায়-
একদিন ছায়া হয়ে যাই
এক চিলতে উঠোনে।

.....

* সুনির্মল কুন্ডু এবং লক্ষ্মী কান্ত কর , কবি, পশ্চিম বাংলা, ভারত।

মিনাক্ষী চাঙমা

ব্যাথার যন্ত্রনা

নীল আকাশের সূর্য্যতা,
যখন দূরে যায়।
তখন বাড়ে বিরহ যন্ত্রণায়,
ভোরের আকাশে পাখিরা.
যখন কিশির মিশির ডাকে
তখন বাড়ে হৃদয়ের কান্না
যখন রাত র্নিঘূম হয়
তখন মনে হয় আমি পৃথিবীতে একা
মান অভিমান সাথে নিয়ে
তোমার সাথে হয় না দেখা
স্বপ্নে বিভোর আমার এই যে মন
যেতে চাই আজ অজানায় হারিয়ে
আজকে আমার ব্যাথার যন্ত্রনা
মন থেকে চাই হারিয়ে
সাগর, নদী, পাহাড়, পর্বত, গহীন অরণ্যে
যেতে চাই বহুদুরে পেড়িয়ে
আজকে আমার মন বদলে
প্রকৃতির সাথে চাই জড়িয়ে
বছর যাই, মাস যাই আর যাই দিন
আমার কাছে থাকবে তোমার ভালোবাসার ঋণ
যত যন্ত্রনা, যত কষ্ট সব দিলাম আমার কপালে,
মিথ্যা ভালোবাসি তুমি আমার জীবনে ছড়ালে

.....

* মিনাক্ষী চাঙমা, দীঘিনালা সরকারী কলেজ।

বর্ণা চাকমা

বাবা

চৈত্রদিনের দুপুরবেলা হাঁটতে হাঁটতে শেষে
ক্লান্ত্ম পথিক শান্ত্মি খোঁজে বটের ছায়ায় এসে।
এমন শান্ত্মি এমন ছায়া যায় কি বলো ভাবা
বটবৃক্ষের মতো ছায়া দেন আমাদের এই বাবা।

বিপদ-আপদ, বান-বন্যা, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়ে
নির্ভাবনায় থাকতে পারি সুরক্ষিত ঘরে।
ঘোর বিপদে এমন আপন আর কি কোথাও পাবা
বলব আমি সবার সেরা ঘরটি আমার বাবা।

বর্ষাকালে হয় যে ছাতা
প্রখর রোদে ছায়া।
ব্যর্থতাতে অভয়বাণী
দুঃখের দিনে মায়া।

ছায়া-মায়া, স্নেহ-শাসন, বাবার ভালোবাসা
জাগায় মনে স্বপ্ন, সাহস ও বেঁচে থাকার আশা।

.....

* বর্ণা চাকমা, বনযোগীছড়া উচ্চ বিদ্যালয়, জুর'ছড়ি।

রিমি চাকমা

বসন্ত

সবশেষে আসে ঋতুরাজ বসন্ত্ম
প্রকৃতিকে করে প্রশান্ত্ম।
বসন্ত্মে গাছে নতুন ফুলের কুড়ি ফোটে
অজস্র সমারোহে প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে।
বসন্ত্মে ফুলে ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল
এসময় পৃথিবী হয় শান্ত্ম ও সুশীতল।
বসন্ত্মে পাখিদের গান আর গান
এ গানে বেজে ওঠে কোকিলের কুহুটান।
বসন্ত্মে আকাশে ওড়ে কত ঘুড়ি ও পাখি
এসব দেখে মন বলে চেয়ে থাকি।
বসন্ত্মের রঙিন মূখ স্নিগ্ধ হাওয়ায়
মানুষের মনকে প্রফুল্ল রাখায়।
বসন্ত্মে ফোটে অশোক, পলাশ-শিমুল
তখন পৃথিবী হয় সৌন্দর্যে অতুল।
বসন্ত্মের দক্ষিণা মলয়, তব পরশনে
হঠাৎ প্রিয়জনের কথা পড়ে মনে।

.....

* রিমি চাকমা, ছাত্রী, বনযোগীছড়া উচ্চ বিদ্যালয়, জুর'ছড়ি।

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যান সমিতি'র

প্রকাশনা সফল হোক ।

সবাইকে জানাই বিজুর শুভেচ্ছা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম গবেষনা কেন্দ্র

রাঙামাটি ।

ছড়াথুম থেকে প্রকাশ হয়েছে

১. গোঝেন - মৃত্তিকা চাকমা
২. মন পরানী - মৃত্তিকা চাকমা
৩. এখনো পাহাড় কাঁদে
৪. বান- মৃত্তিকা চাকমা
৫. এ্যাংকুর - মৃত্তিকা চাকমা
৬. মেঘ সেরে মোনো চুক - মৃত্তিকা চাকমা
৭. কর্মফল - মৃত্তিকা চাকমা
৮. চাকমা গল্প - সম্পাদনা - মৃত্তিকা চাকমা ও সন্তোষ চাকমা
৯. চাকমা নাট্য গ্রন্থ - সম্পাদনা - সন্তোষ চাকমা
১০. জুম গাভুরী - তরুন কুমার চাকমা
১১. মন চিদ আহ্ঙি যায় - প্রগতি খীসা
১২. হরিৎ নিসর্গ - মুজিবুল হক বুলবুল
১৩. চাকমা গানের স্মরলিপি - মনোজ বাহাদুর
১৪. বিদায় ক্ষণে - চিত্র মোহন চাকমা
১৫. ডা: ভগদত্ত খীসা রচনাস্মারক,সম্পাদনা - মৃত্তিকা চাকমা
১৬. মৃত্তিকা চাকমা'র নির্বাচিত প্রবন্ধ ও চিত্রকলা,সম্পাদনা-দ্যানিস চাকমা
১৭. কবি সলিল রায় এর 'দুঃস্বপ্ন'

যোগাযোগ
মোবাইল ঃ ০১৮১৫৬৬২৯২৮
e-mail: mrittika_cht@yahoo.com

বিঝু বয়ে আনুক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি

বনযোগীছড়া ইউনিয়নবাসীকে

জানাই বিঝুর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সন্তোষ বিকাশ চাকমা

চেয়ারম্যান,
০২ নং বনযোগীছড়া ইউনিয়ন পরিষদ
জুর'ছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

দৃষ্টি আকর্ষন!

গত ০৬ জানুয়ারী ২০১২ খ্রিঃ রাঙামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার চালু করা হয়। বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় এ পাঠাগারটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এ পাঠাগারে দুইটি দৈনিক পত্রিকা সহ হাজারখানেক বই সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা আরো বই সংগ্রহ করছি। যে কোন ধরনের বই (নতুন বা পুরাতন) আমরা গ্রহণ করি। কেউ যদি আমাদের পাঠাগারে বই দিয়ে সাহায্য করতে চান তাহলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নির্মল কান্তি চাক্‌মা
মোবাইল: ০১৫৫৬৫৭৬৫৩৮
Email: bkkksrj@yahoo.com
পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক
বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি
বনযোগীছড়া, জুর'ছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

এ হ্‌রিঙ দুম্মুরানি দিনত

যেন আহ্‌র্জি ন'যায়

বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি

চিত্‌দিঘোল কোচপানা

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)

বিঝু ২০১৪ ইং সফল হোক।
সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

প্রধান কার্যালয়: রাঙ্গামাটি।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।

ফোন ঃ ০৩৫১-৬৩১৩২,৬৩১৪৭,৬৩২০৭
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৩৫১-৬২১৯২

বিঝু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু ' ২০১৪ উপলক্ষে বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সংকলন প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুসম্পদ, সংস্কৃতি, কুটির শিল্প, সমাজসেবা, জনস্বাস্থ্য, সমবায়সহ ২৩টি হস্তান্তরিত বিভাগের মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে।

এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে সর্বাত্নক সহযোগিতা কামনা করছি।

নিখিল কুমার চাকমা
চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

Phone-0371-62149, Fax-0371-62610
www.knsikhagrachari.org

ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর গবেষণা পত্রিকা'র জন্য লেখা আহব্বান

খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট হতে আগামী ২০১৫ খ্রিঃ হতে নিয়মিতভাবে একটি ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। যার ১ম সংখ্যা আগামী জুন ২০১৫ খ্রিঃ-এ প্রকাশ করা হবে। উক্ত পত্রিকার জন্য আগ্রহী লেখক / গবেষকদের নিকট হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর বিষয়ে যে কোন মৌলিক গবেষণা মূলক লেখা আহব্বান করা হচ্ছে। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার জন্য গবেষকদের সম্মানী প্রদান করা হবে। লেখা A 4 সাইজ কাগজে কম্পিউটারে টাইপ করে সিডিতে করে অথবা ই মেইল chakmasusamoy@yahoo.com যোগে প্রেরণ করা যাবে। লেখকের নাম, ঠিকানা উল্লেখসহ উপ পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি-এর বরাবরে লেখা পাঠাতে হবে।

সুসময় চাকমা
উপ পরিচালক
ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
খাগড়াছড়ি
ফোন ০৩৭১-৬২১৪৯, ফ্যাক্স-০৩৭১-৬২৬১০